https://doi.org/10.62328/sp.v56i1.8

অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় : কর্তৃত্ববাদবিরোধী বয়ান

মোঃ নাজমুল হোসেন*

সারসংক্ষেপ:

ইউরোপের বিজ্ঞানশোধিত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) উনিশ শতকের বাংলায় আলোড়ন-সৃষ্টিকারীদের একজন। *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* (১৮৭০ ও ১৮৮৩) তাঁর মনস্বিতার স্মারক। এই গ্রন্থে তিনি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার সমন্বয়ে, ঔপনিবেশিক প্রাচ্যবাদী চিন্তাধারায় ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্মসম্প্রদায়ের ভিন্নমাত্রিক পরিচয় উন্মোচন করেছেন। যেখানে স্পষ্টতই তাঁর অবস্থান কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে। ঔপনিবেশিক ইউরোপের আগ্রাসী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে স্থাপন করেছেন, আবার বহু ধর্ম অধ্যুষিত ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তিক উপাসকসম্প্রদায়ের অবস্থানকে তিনি নির্দেশ করেছেন উগ্র হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বের প্রতিরোধী হিসেবে। বর্তমান প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রাচ্যবাদ চর্চার প্রেক্ষাপট, ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের পরিচিতি এবং কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার দত্তের অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

উপনিবেশিত ভারতবর্ষে তথা বাংলায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে যাঁদের শাণিত দৃষ্টি তৈরি হয়েছিল, বাংলার রেনেসাঁ পূর্ণতা পেয়েছে যাঁদের হাত ধরে, নিঃসন্দেহে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) তন্মধ্যে অন্যতম। ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ববাদী কাঠামোর ভেতরে অবস্থান করেও, ইউরোপ কর্তৃক ভারত শাসনের পথ সুগম করার প্রকল্পের অংশভাগী হয়েও তিনি স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি প্রাচ্য তথা ভারতবিদ্যায় গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। আর এই চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনচিন্তায় প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয় তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন। পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা অক্ষয়কুমারের বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল বলে ভারতীয়দের জন্য নির্ধারিত

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডের সীমায় আবদ্ধ না থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়েতিনিস্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে সক্ষম হয়েছেন, তবে তিনি হিন্দুত্বের ঐতিহ্যগর্বে মোহাচ্ছন্ন হয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারে আগ্রহীছিলেন না। দুই খণ্ডে লিখিত *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* (প্রথম ভাগ-১৮৭০ এবং দ্বিতীয় ভাগ-১৮৮৩) গ্রন্থে অক্ষয়কুমারেরএইস্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞান-শোধিত যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অক্ষয়কুমার প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ চিন্তার উন্মোচনের পাশাপাশি তাঁর সমকালে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উৎস সন্ধান করেছেন এবং সেসব সম্প্রদায়ের যাপিত জীবন ও কৃত্যানুষ্ঠানের বিবরণ উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রে "বাংলায় প্রত্যক্ষণ-ভিত্তিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।"(শ্যামলী সুর, ২০০২:২৬-২৭)

পাশাপাশি তিনিভারতীয় ধর্ম-দর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ধর্ম ও উপাসক সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আস্তিক্যবাদী ধর্ম-দর্শনকে তিনি 'মানসিক-রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করে, সেই রোগের প্রতিকার সন্ধান করেছেন। এদিক থেকে বলা যায় ঔপনিবেশিক শাসনামলে সমাজব্যবস্থায় উপনিবেশ এবং ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার প্রান্তিক উপাসক সম্প্রদায়েরপ্রতিরোধের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন। আর্যগৌরবের উত্তরাধিকারীভারতীয় হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদী ইতিহাসের চাপে ঢাকা পড়ে যাওয়া ব্রাত্য ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ধর্মাচার, যা ইতিপূর্বে কোনো ইতিহাসবিদের গবেষণার বিষয় হয়নি, সে সকল ধর্ম ও দর্শনের স্বরূপ উন্মোচন করেছেনতিনি। প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ জ্ঞানকাণ্ডের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপীয় কর্তৃত্ববাদী চিন্তাধারাকে তিনি যেমন প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, তেমনি ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে চলে আসা অন্ত্যজদের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বের শৃঙ্খল ভাঙার ইতিহাস বর্ণনাকরেছেন*ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* গ্রন্থে।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির নিবিড় পাঠের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ইউরোপীয়দের দ্বারা, যাকে অভিহিত করা হয়েছে প্রাচ্যবিদ্যা নামে; বর্তমান প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার কর্তৃক সেই প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রেক্ষাপট এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের পরিচিতিতুলে ধরার প্রয়াস থাকবে। পাশাপাশি আমরা দেখবো কীভাবেঅক্ষয়কুমার কর্তৃক প্রাচ্যবাদী জ্ঞানকাণ্ডের আলোকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাগ্রসরতা অঙ্গীকার করেও, ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রাচীন ভারতের জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আর প্রবন্ধের শেষাংশে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যগর্বেগর্বিত উগ্র হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের সামনে বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের

উপস্থিতি ঘোষণার মাধ্যমে অক্ষয়কুমারের ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বের বিরোধিতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা থাকবে।

১. প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রেক্ষাপট

ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষে এসেছিল সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে, বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদ প্রসার তাদের মূল লক্ষ্য হলেও এদেশীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ধর্মও তাদের লোলুপ দৃষ্টি এড়ায়নি। আর সেজন্যই ইউরোপ তার সাংস্কৃতিক উদগ্র ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রতিষ্ঠা করে এশিয়াটিক সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠান; যেখান থেকে শুরু হয় বাঙালির ভাবের ঘরে চুরির উদ্যোগ। তারা এদেশে বস্তুগত সম্পদের অনুসন্ধানের পাশাপাশি বৌদ্ধিক সম্পদেরও অনুসন্ধান শুরু করে। অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখতে উপনিবেশিতের চিন্তাজগৎ নিয়ন্ত্রণে রাখাটা তাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছিল।

ইতালির রেনেসাঁ ইউরোপে আলো জ্বালিয়েছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে সমগ্র ইউরোপকে মুক্তি দিয়েছে। আর সেই রেনেসাঁর আলো দিয়েই ইউরোপ সামন্ততন্ত্রের নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটায়, পাশাপাশি আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে সমগ্র বিশ্ব জয় করে নেয়। এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রকল্পের পাশাপাশি ছিল বৌদ্ধিক প্রকল্প। আর এক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে 'রেনেসাঁ' নামক আইডিয়ার, যার অর্থ ছিল মূলত জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, গভীর পঠন-পাঠনের মাধ্যমে বৌদ্ধিক ভুবন নির্মাণের প্রয়াসী ছিলেন তাঁরা। মধ্যযুগের নীতিশুষ্ক সমাজব্যবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিকল্প পথের সন্ধানে তাঁরা অতীতে ফিরে যান এবং প্রাচীন গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতির মধ্যে তাঁদের প্রত্যাশিত পথের সন্ধান পেয়ে যান,কারণ সে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ছিল অপেক্ষাকৃত জীবনবাদী। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে শুরু হয় যে রেনেসাঁ, সেই মানুষকে আত্মসচেতন ও সক্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যেই গড়ে ওঠেছিল হিউম্যানিস্ট আন্দোলন।

অর্থাৎ রেনেসাঁ ছিল একটি সাংস্কৃতিক লড়াই, যেখানে পুরোনো ধ্যান-ধারণা বদলে নতুন মূল্যবোধে জাগ্রত সমাজ গঠনের প্রয়াস ছিল। ব্যক্তি-প্রতিভার উন্মেষের এই যুগে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত ও শাণিত ভাষায় প্রচার-পুস্তিকা লিখে এবং প্রাচীন/ক্লাসিক পাণ্ডুলিপির অনুবাদ ও পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে পুরোনো জ্ঞানের পুনরুদ্ধার করে মানুষকে সচেতন, জীবনবাদী করে তোলাই ছিল হিউম্যানিস্টদের প্রধান লক্ষ্য। জীবনতৃষ্ণ এই মানুষগুলোর মনে ছিল অসংখ্য প্রশ্ন, যার উত্তর সন্ধান করেছে তাঁরা বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। একদিকে উগ্র সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা অন্যদিকে জ্ঞানস্পৃহা ইউরোপকে আরও বেশিসক্রিয় করে তুলেছিল; যদিও তাদের জ্ঞানস্পৃহার মূলেও ঔপনিবেশিক মানসিকতাই কার্যকর ছিল। তাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন,

> কেবল... স্বর্ণ, রৌপ্য, পণ্যদ্রব্য প্রভৃতি পার্থিব সম্পদেই ইউরোপের মনীষা তুষ্ট থাকিতে পারিল না। এই মনীষা বিশেষ করিয়া এশিয়া খণ্ডের সুসভ্য জাতিগণের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আহরণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। (গৌরাঙ্গগোপাল, ১৯৭৭: ভূমিকা ১২)

বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আধিপত্য স্থাপনের জন্য উপনিবেশিত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লক্ষ্যই থাকে বিজিত অঞ্চলের মানুষের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করা; যাতে শোষিত জাতিকে হীনমন্য করে রাখা যায়। ভারতেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইউরোপের উপনিবেশ যেমন রাজনৈতিক ছিল তেমনি তা গভীরভাবে সংস্কৃতিগতও ছিল। রেনেসাঁউদ্ভূত ইউরোপীয় সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। এদেরই একজন স্যার উইলিয়াম জোন্স, যিনি বিচারপতি হিসেবে কলকাতায় এসেছিলেন। রেনেসাঁ-উত্তরকালে জ্ঞানস্পৃহা ইউরোপের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, তাই যুগপ্রভাবে জোন্স ভাষা শিখেছিলেন অনেকগুলো; এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সংস্কৃত ভাষার সন্ধান পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষে আসার পথে জাহাজে বসে সংস্কৃত শেখা শুরু করেন, অচিরেই তিনি হয়ে উঠেন সংস্কৃত বিশারদ। ভারতীয় সভ্যতাকে গভীরভাবে পাঠ করার জন্য তিনি একাডেমিক সুশৃঙ্খল আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁর সেই ভাবনার মূর্তরূপ এশিয়াটিক সোসাইটি; ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত এই সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উইলিয়াম জোন্স বলেছিলেন,

> the bounds of its investigations will be the geographical limits of asia and within these limits its enquires will be extended to whatever is performed by man or produced by nature. (গৌরাঙ্গগোপাল, ১৯৭৭: ভূমিকা ১৩-১৪)

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে ভারতবর্ষের নিবিড় অধ্যয়ন শুরু হওয়ার পর ভারতীয় সভ্যতার বহু অজানা বিষয় প্রকাশ্যে চলে আসে। এখান থেকেই *Orientalism* অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ভারতবিদ্যা, পৃথিবীর বিদ্বৎমহল তথা ইউরোপের চর্চার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। ইউরোপীয়দের ভারতবিদ্যা চর্চার পথিকৃৎ হিসেবে কৃতিত্বের আসনে আসীন স্যার উইলিয়াম জোন্স, তাই বলা হয়ে থাকে :

> ইয়ুরোপের এক শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ মনের (জোন্স) মধ্যে এশিয়া খণ্ডের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য যে আলোড়ন উত্থিত হয় তাহাকেই ইয়ুরোপের *oriental studies* বা প্রাচ্যবিদ্যার ভিত্তি বলিতে পারা যায়। (গৌরাঙ্গগোপাল, ১৯৭৭: ভূমিকা ১৩)

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসবিদদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জোন্সের সংস্কৃত চর্চার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান ইউরোপে পৌঁছেছে তার মাধ্যমে ইউরোপ নিজেকে জানতে সক্ষম হয়েছে, এবং ইউরোপে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপের সংস্কৃত চর্চা দেখে ভারতবর্ষ আত্মসমীক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং উপনিবেশিত ইতিহাসবিদেরা এটাও বলেন যে, "ভারত এইভাবে ইউরোপের সহায়তায় নিজের অবলুপ্ত আত্মচেতনাকে খুঁজিয়া পাইল" (গৌরাঙ্গগোপাল, ১৯৭৭: ভূমিকা ১৪)

ঔপনিবেশিক পর্বের ইতিহাসবিদগণ, ইউরোপীয়দের ভারতবিদ্যা চর্চাকে শুধু স্বাগত জানিয়েছে তাই নয় বরং তারা কৃতার্থ বোধ করেছে; কেননা ইউরোপের মতো শিক্ষিত জাতির সংস্পর্শে এসে ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্য উদ্ভাসিত হয়েছে। এছাড়া ইউরোপীয়রা ভারতের ইতিহাস শুধু উদ্ধারই করেনি, সারা পৃথিবীতে তার প্রচারও করেছে। এমনকি তাদের কল্যাণেই প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন পুথিপত্র ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ফরাসি গ্রন্থাগার এবং ইউরোপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত হয়ে রক্ষিত হয়েছে বলে উপনিবেশাচ্ছন্ন ইতিহাসবিদদের ধারণা। যদিও ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইউরোপীয়দের আগ্রহের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপট বিদ্যমান, কেননা—

> আরবীয় পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নানা জ্ঞানের প্রচার ঘটেছিল পারস্য ও পাশ্চাত্য জগতে। তখন থেকেই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে এই কৌতূহল তৈরি করে দেবার কৃতিত্ব আরব ও পারস্য বিদ্বৎসমাজের। ভারতবিদ্যার ব্যাপক চর্চা শুরু হয় খুবই আধুনিক কালে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। এবং সেটা প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের মাধ্যমে। এই সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে নানা জটিল জালও বিস্তার লাভ করে। তার মধ্যে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা একটা। (সাইফুল, ২০০৯:১৮৯-১৯০)

প্রথম পর্যায়ে ইউরোপীয়দের মধ্যেই ভারতবিদ্যার চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল, ফলে আমরা দেখবো যে, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম কমিটিতে কোন বাঙালি সদস্য ছিল না, সকলেই ইউরোপীয়। অচিরেই ইউরোপীয়রা তাদের সহযোগী পেয়ে গেল, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন পেয়েছিল। পাশ্চাত্য দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চোখ ধাঁধানো আলো অথবা আলেয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে ভারতীয় পণ্ডিতেরাও ইউরোপীয়দের অনুসরণে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভারতবিদ্যার চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এই উভয় শ্রেণির পণ্ডিতদের চর্চার ফলে প্রাচ্যবিদ্যা প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো রূপ লাভ করে।

ব্রিটিশ উপনিবেশের বদৌলতে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর জোয়ার বাংলায়ও আছড়ে পড়েছিল বলে কথিত আছে। ইতিহাসবিদগণ যাকে বাংলার নবজাগরণ বলে আখ্যায়িত করেন। বাঙালির সেই জাগরণের প্রথম ভাগে অর্থাৎ উনিশ

শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা আধুনিক শিক্ষা, বাঙালি সাগ্রহেআত্মস্থ করেছে। এই পর্বেই বাঙালি পণ্ডিতদের ভারতবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত ঘটে, সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অনুসরণে এবং অনুকরণে। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার দ্বিতীয়ার্ধে জেগে উঠে ভারতের সচেতন মন অর্থাৎ "উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রবল ছিল পাশ্চাত্যানুরাগ দ্বিতীয়ার্ধে বড় হয়ে উঠল স্বাজাত্যভিমান" (শক্তিসাধন, ২০১৯: ৫১)। অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙালি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য, যিনি নবজাগৃতির অংশ হিসেবে ইউরোপের অনুসরণে ভারতবিদ্যা চর্চায় ব্রতী হন।

২. পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব

পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে বঙ্গদেশে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন ব্যক্তির ওপর পড়েছিল, অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁদের মধ্যে একজন। বিদ্যা-বিচার ও বিজ্ঞানবুদ্ধির আলোকে তিনি বহু ধর্ম অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচয় ও তাদের ধর্মাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, ভারতীয়রা তাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সন্ধান পেয়েছে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের কল্যাণে। পাশ্চাত্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষ করে শব্দবিদ্যার গুরুত্ব স্বীকার করে তিনি বলেন,

> যতদিন সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁহাদের কর-স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই, ততদিন ঐ শব্দবিদ্যার অবয়ব-সংস্থান-মাত্রও সুসম্পন্ন হয় নাই। ঐ পূর্ব্বকালীন অতুল্য ভাষা তদীয় করস্থ হইবা মাত্র ঐ অদ্ভুত বিদ্যার অনুপম মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল এবং অনতিবিলম্বেই উল্লিখিত গুরুতর তত্ত্বটি সুসিদ্ধ করিয়া তুলিল। ঐটি অবধারিত হওয়াতে পূর্বোক্ত আদিম জাতির আর্য্য-কুলের পুরাবৃত্তের প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকটিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: ২-৬)

উইলিয়াম জোন্স ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন ভাষার তুলনা প্রতিতুলনা করে প্রমাণ করেন যে, ইউরোপ এবং এশিয়ার সকল ভাষা একই ভাষাবংশের অন্তর্ভূক্ত, যার নাম দেন তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। এছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষার সাদৃশ্য প্রদর্শন করে ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার সম্পর্কসূত্র নির্মাণ করেন। একই সঙ্গে ভাষার পাশাপাশি আর্য জাতিগোষ্ঠীরও পরিচয় প্রদান করেন তিনি। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে অক্ষকুমার বলেন, "ধন্য শব্দবিদ্যা! ইয়ুরোপীয় শাব্দিকদিগকে শতবার ধন্যবাদ! আমরা ঐ মৃত সঞ্জীবনী শব্দবিদ্যা প্রভাবে ঐ অপরিজ্ঞেয়কল্প আর্য্য-বংশীয়দিগের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।" (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: ১৩-১৪)

এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের আরও একটি সম্পর্কসূত্র নির্মাণের প্রয়াসী ছিল ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেটা হলো বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের সাদৃশ্য প্রণয়ন। অক্ষয়কুমার

জানিয়েছেন, ফরাসি পণ্ডিত লাবুলে এবং জার্মান পণ্ডিত লিএব্‌রেখট্ অনুসন্ধান করে বের করেছেন যে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায় জোসফট নামক জনৈক সাধু ব্যাক্তিকে স্বর্গ-ভোগী সিদ্ধ পুরুষ হিসেবে সম্মান জানায়, এই সাধু পুরুষ আর কেউ নন, স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ। অক্ষয় বলেন, "রোমেন ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ীরা ঐ জোসফ্টকে অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় বুদ্ধদেবকে আপনাদের একটি সেন্ট্ বলিয়া পরিগণিত করিয়া লন।" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: ২৫৭)

ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ বেদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন অক্ষয়কুমার। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সমৃদ্ধ দলিল বেদ, বৈদিক যুগে রচিত হলেও তাতে নিহিত রয়েছে চিরকালীন জীবনবাদী আবেদন। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তকদের চিন্তার সার নিহিত রয়েছে বেদে, যা আর্যরা পুরুষানুক্রমে রক্ষা করে আসছিল কিন্তু বৈদিক-সংস্কৃত ভাষা মৌখিক ভাষার অবস্থান থেকে সরে যাওয়ায় বেদধৃত জ্ঞান মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। কিন্তু তাই বলে আধুনিককালে,

> হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র অসার, একথা অক্ষয়কুমার বলেননি। বরং তিনি একথাই বলেছিলেন, ঐগুলিকে আপ্তবাক্য রূপে পূজা করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলির প্রকৃত সারবত্তা কোথায়, সেটাই আমরা ভুলে গেছি। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে সেই প্রকৃত সারবত্তা খুঁজে বার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য- এই ছিল তাঁর বক্তব্য। (আশীষ, ২০২০: ১৫)

প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের পুরোনো জ্ঞান অনুসন্ধানের প্রকল্পের আওতায় সেই জ্ঞান পুনরায় উন্মোচিত হয়েছে, আর এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রাপ্য। কেননা "এখন মহানুভব ইয়ুরোপীয় আর্য্যেরা উহাকে মৃত-সঞ্জীবন মুদ্রাযন্ত্রে অধিরূঢ় ও অঙ্কিত করিয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। উহার অধিকাংশ অতীব প্রাচীন।" (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: উপ. ৬৪)

ইউরোপীয় রেনেসাঁ যে ব্যক্তি-প্রতিভার জন্ম দিয়েছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন তথা বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে তাঁরা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ছাপ রেখেছেন। বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে রোমান্টিক চিন্তার পরিবর্তে যুক্তিশাসিত সুশৃঙ্খল ভাবনার বিন্যাস তুলে ধরেছেন, ভারতীয় প্রাচীন মনীষীরা তা করতে পারেননি। ইউরোপের চিন্তার প্রাগ্রসরতা প্রমাণে তাই অক্ষয়কুমার সাঙ্খ্য শাস্ত্রের কথা বলেন; এই শাস্ত্রে বুদ্ধির প্রাখর্য্য অসামান্য কিন্তু কল্পনার বিস্তারে তা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আর প্রাচীন ভারতে যেহেতু বেকন্ ও কোঁতের মতো চিন্তাবিদের জন্ম হয়নি, ফলে সে সময়ে এর অধিক প্রত্যাশা করাও সমীচীন নয় বলে অক্ষয় মনে করেন। এছাড়া উনিশ শতকের বাঙালি পণ্ডিতগণ মনে করতেন, আধুনিক ইউরোপ জ্ঞানরাজ্যের ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে, ফলে ইউরোপের ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় বিধৃত জ্ঞান অর্জন করা গেলেই সুশিক্ষিত হওয়া সম্ভব আর যদি এসব ভাষার জ্ঞান অর্জন করা যায় তাহলে সংস্কৃত ভাষা তথা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে অধিক কিছু পাওয়ার থাকে না। অর্থাৎ

> জ্ঞান-রত্নের আকর-স্বরূপ পূর্বোক্ত তিনটি ভাষার (ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান) একটি শিক্ষা করিবার উপায় থাকিলে, প্রকৃত জ্ঞান-লাভ উদ্দেশে অপর সাধারণ সকলের সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া কাল-ক্ষেপ ও আয়ু-ক্ষয় করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: উপ. ৩৩)

আবার সংস্কৃত শাস্ত্রে যে জ্ঞান নিহিত আছে, তা যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করাও ভারতীয় বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়। এই জ্ঞান আহরণের জন্য ইউরোপীয় জ্ঞানের আশ্রয় নেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে অক্ষয়কুমার মনে করেন। অর্থাৎ শুধু প্রাচীন ভাষাশিক্ষা ফলপ্রসূ কোনো বিষয় হবে না বরং আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি তিনি গুরুত্বারোপের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য সংস্কৃত চর্চার গুরুত্বকে তিনি অস্বীকার করেননি।

অক্ষয়কুমার প্রাচীন ভারতীয় সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনের সারগর্ভ আলোচনা করে ভারতীয় পণ্ডিতগণের চিন্তার উৎকর্ষের বহু নিদর্শন উপস্থাপন করেছেন কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা বিজ্ঞানসম্মত ছিল না, ফলে চিন্তাকাঠামোর এই ত্রুটিগুলোকে তিনি ভারতের পশ্চাৎপদতার স্মারক হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে ইউরোপকে তিনি চিন্তাজগতের শ্রেষ্ঠত্বের আসন প্রদান করেছেন। কেননা সেখানে বেকন, কোঁতের মতো চিন্তকের আবির্ভাব ঘটেছিল যাদের প্রচেষ্টায় ইউরোপের চিন্তাপ্রণালী বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু চিন্তাশীল মনের উদ্ভব শুধু ইউরোপেই ঘটেছে, ভারতবর্ষে এমন কোনো চিন্তকের আবির্ভাব ঘটেনি ফলে ভারতের চিন্তাও সুসংহত রূপ লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই অক্ষয়কুমার আক্ষেপের সুরে বলেন,

> যদি(ভারতীয় পণ্ডিতেরা) তত্ত্বানুসন্ধানের প্রকৃত পথাবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ-মার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, তবে বহুকাল পূর্ব্বে ভারত-ভূমিও ইয়ুরোপ-ভূমির ন্যায় এ ভূ-স্বর্গ-পদে অধিরূঢ় হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণের নিশ্চিত উপায় চেষ্টা না করিয়া কেবল আপনাদের অনুধ্যান-বলে দুই একটি প্রকৃত মতের সহিত অনেকগুলি মনঃকল্পিত মত উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের একটি পথ-প্রদর্শকের অভাব ছিল। একটি বেকন্– একটি বেকন্–একটি বেকন্ তাঁহাদের আবশ্যক হইয়াছিল। ...কিন্তু বুঝি এ জল-বায়ু-মৃত্তিকায় প্রকৃত তত্ত্ব-পথ-প্রদর্শনী, যুগ-প্রলয়-কারিণী, নবোদ্ভাবিনী, মহীয়সী বুদ্ধি-শক্তির সমুদ্ভাব হওয়া সম্ভব নয়। সে ব্যাপারটি বুঝি ইয়ুরোপেরই কার্য্য। (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: উপ. ৫২)

৩. প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ধারায় *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়*

ইউরোপ কর্তৃক ভারতের বৌদ্ধিক সম্পদ আহরণপ্রকল্পের আওতায় ১৮২৮ ও ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে হোরেস হাইমেন উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০) এশিয়াটিক জার্নালে হিন্দু উপাসক

সম্প্রদায় সম্পর্কিত দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রবন্ধ দুটি *Religious Sects of the Hindus*-সংজ্ঞক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাঁর পূর্বে কাশীর রাজার মুন্সী শীতল সিংহ এবং কাশী কলেজের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ মথুরানাথ ফারসি ভাষায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের উপর দুটি গ্রন্থ রচনা করেন, সেই গ্রন্থের সঙ্গে নাভাজী ও নারায়ণ দাসের হিন্দি *ভক্তমাল*, ব্রজভাষায় লিখিত প্রিয়দাসের *ভক্তমাল* গ্রন্থের টীকা এবং বাংলা ভাষায় লিখিত কৃষ্ণদাসের টীকাভাষ্যসহ উপাসক সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বনে উইলসন তাঁর প্রবন্ধ প্রস্তুত করেছিলেন। উইলসনেরগ্রন্থ অবলম্বনেই অক্ষয়কুমার দত্ত দুই খণ্ডে *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* রচনা করেন, যদিও অক্ষয়ের তথ্যনিষ্ঠা ও মৌলিকতায় গ্রন্থটি অনন্য। এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে সুকুমার সেন বলেন,

> অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে দুইভাগ '*ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*' (১৮৭০, ১৮৮৩), গ্রন্থটি অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনাই নয়, বাঙ্গালা ভাষায় একটি বিশিষ্টতম গ্রন্থ বটে। হোরেস হেম্যান উইলসনের *Essays and lectures on the religion of the Hindus* অবলম্বনে রচিত হইলেও অক্ষয়কুমার ইহাতে অনেক নূতন বস্তু যোগ করিয়াছেন। উপক্রমণিকা দুইটিতে অক্ষয়কুমারের শ্রমশীল পাণ্ডিত্যের ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে। (সুকুমার, ১৪২১: ১৩৫)

অক্ষয়কুমার এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই নিজস্ব মন্তব্য পরিবেশন করেছেন, উইলসনের ভ্রম নিরসনের সর্বাত্মক প্রয়াস পেয়েছেন এবং অনেক নতুন বিষয় যোগ করেছেন। তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়কে প্রধানত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা-বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। এই পাঁচ উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম তিনটি বিভাগের আবার ১৮২ টি উপবিভাগ দেখিয়েছেন; অথচ উইলসন মাত্র ৪৫ প্রকার উপাসকের উল্লেখ করেছেন। এখানে অক্ষয়কুমার এমন সব উপাসকদের কথা তুলে ধরেছেন, পূর্বে যাদের কথা কেউ উল্লেখ করেনি।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় প্রথম ভাগে অক্ষয়কুমার দত্ত হিন্দু ধর্মের উৎস অনুসন্ধান করেছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোকে অক্ষয়কুমার দত্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সমান্তরালে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বলেন,

> লাটিন ও গ্রীক, কেল্‌টিক ও টিউটোনিক, লেটিক ও স্লেবোনিক, হিন্দু ও পারসীক ইত্যাদি বিভিন্ন বংশীয় বিভিন্নজাতি একটি মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরম মনোহর মহত্তম তত্ত্বটি ইউরোপীয়দিগের শব্দবিদ্যানুশীলনের, বিশেষতঃ সংস্কৃত-চর্চার সুধাময় ফল। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮:উপ.৩)

অক্ষয়কুমার জানিয়েছেন, হিন্দু বলে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা ভারতের আদিম অধিবাসী নয়; তাঁরা বহিরাগত। এদের পূর্বপুরুষ আর্যরা এশিয়ার মধ্যভাগে বাস করতেন। মানব-

জাতির বিদ্যা-বুদ্ধি, সামাজিক অবস্থা ও স্থান-কাল অনুযায়ী ধর্মজ্ঞান ও ধর্মানুষ্ঠান গড়ে ওঠে; তাই কালক্রমে আর্যজাতি, পূর্বে আয়ারল্যান্ড থেকে পশ্চিমে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে তেমনই তাঁদের ধর্মভাবনায়ও বৈভিন্ন্য দেখা দেয়। অক্ষয়কুমার বলেন,

> ঐ আদিম ধর্মই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রীসে গ্রীক, রোমকে রোমক, জর্ম্মেনিতে জর্ম্মেন্, পারসীকে পারসীক এবং হিন্দুদিগের দেশে হিন্দু ধর্ম্ম রূপে পরিগণিত হয়। ঐ আদিম ধর্ম্মই হিন্দু-ধর্ম্মের মূল-স্বরূপ। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: উপ. ১৩)

ইন্দো-ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আচার-সংস্কৃতির মধ্যে মিল লক্ষ করে অক্ষয়কুমার এসব জাতিগোষ্ঠীর অভিন্ন উৎস হিসেবে আর্য জাতিকেই চিহ্নিত করেন। বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ সহযোগে অক্ষয়কুমার দেখিয়েছেন, ভাষাগত মিলের পাশাপাশি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীর দেবতা ও ধর্মভাবনায়ও প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গ্রিক, পারসিক এবং ভারতীয় বৈদিক ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন,

> পুরাকালীন আর্য্যেরা গগন ও গগনস্থ বস্তুও গগনগত ব্যাপারেরই উপাসক ছিলেন। তাঁহারা উন্নত নয়নে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেন, আর ঐ সমুদায়ের অভাবনীয় অদ্ভুত ভাব অবলোকন করিয়া ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইতেন। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: উপ. ২৪)

পরবর্তীকালের হিন্দুধর্ম আদিম আর্যদের ধর্মভাবনার বিবর্তিত রূপ হলেও, অনেক আচার পদ্ধতি পরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, ফলে আদিম আর্যোদ্ভূত অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের আচার-সংস্কারের সঙ্গে এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে হিন্দু সমাজে বর্ণবিচারের প্রচলন আর্য জাতি একত্র থাকার সময় ঘটেনি বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। আর্য থেকে হিন্দুধর্মের যাত্রার মধ্যপথে ভারতবর্ষীয় আর্য এবং পারসিক আর্যরা অন্যদের তুলনায় বেশি সময় একত্র থাকার ফলে পারসিক ও হিন্দুদের শাস্ত্র ও ধর্মভাবনায় অধিক মিল বিদ্যমান। হিন্দু ও পারসিকদের অভিন্ন ধর্মপ্রণালী লক্ষ করে অক্ষয়কুমার বলেন,

> ঐ ধর্ম্ম-প্রণালীকে আদিম হিন্দু-ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া অক্লেশেই উল্লেখ করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষীয়দিগের বেদ ও পারসীকদিগের অবস্তার অন্তর্গত যে যে বিষয়ের সমধিক ঐক্য বা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা উহাদিগের ঐ সময়ের ধর্ম্ম বলিয়া নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশিত হইতে পারে। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: উপ. ৩৫)

অর্থাৎ বৈদিককালে ভারতীয় বৈদিক ও পারসিক ধর্মের সাদৃশ্য প্রমাণ করে যে এরা অভিন্ন উৎসজাত। সময়ের ব্যবধানে বেদ ও আবেস্তার অভিন্ন বাণী ভিন্ন তাৎপর্যে গৃহীত হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে বৈপরীত্যে পর্যবসিত হয়েছে। বৈপরীত্য-বিরোধের জেরে হিন্দুর পূর্বসূরী আর্যদের ভারতবর্ষে প্রবেশ ঘটে এবং বিভিন্ন আদিম অধিবাসীদের পদানত করে উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতবর্ষে আর্যদের উপনিবেশ স্থাপনকাল থেকে শুরু করে

অক্ষয়কুমার ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় ধর্মের ইতিবৃত্ত রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি মনে করেন, "বেদ সংহিতা ভারতবর্ষীয় হিন্দু-ধর্ম্মের আদিম অবস্থা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সমুদায় দ্বিতীয় অবস্থা, কল্পসূত্র ও স্মৃতি-সংহিতা সকল তৃতীয় অবস্থা এবং পুরাণ ও তন্ত্র চতুর্থ অবস্থা প্রকটন করিতেছে।" (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: উপ. ৬৩)

তিনিজানিয়েছেন সমগ্র বেদ একসময়ে রচিত নয়, বিশেষ করে বেদের মন্ত্র-ভাগ প্রাচীন হলেও ব্রাহ্মণ-ভাগ যথেষ্ট আধুনিক। আবার বিভিন্ন বেদের মধ্যকার তাৎপর্য, রচনাপ্রণালী ও ব্যকরণগত পার্থক্যও বিদ্যমান। এক্ষেত্রে ঋগ্বেদ সংহিতাকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করে তিনি বলেন, "বহু-ব্যাপারশালী যজ্ঞানুষ্ঠান হিন্দু জাতির প্রথমকার ধর্ম্ম নহে; উহা ক্রমে ক্রমে অধিককালে কল্পিত হইয়াছে"(অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: ৬২)অর্থাৎ আদিতে হিন্দু ধর্ম সরল থাকলেও কালক্রমে আনুষ্ঠানিক জটিলতা প্রাপ্ত হয় এবং বেদের মন্ত্র পরবর্তীকালের যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রযুক্ত হয়।

আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্বে বেদের কিছু অংশ রচিত হয়ে গিয়েছিল, ভারতে প্রবেশের পরেও বেদের রচনাকার্য চলমান ছিল, তাই ভারতে আর্যদের অধিকৃত স্থানের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব বেদে লক্ষ করা যায়। বৈদিক ধর্মে এই প্রভাব সম্পর্কে অক্ষয়কুমার বলেন,

> ইদানীং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থকার সকলে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি যে সমস্ত অভিনব দেবতার উপাসনা-প্রণালী প্রচার করিয়াছেন, তখন তাহা প্রচলিত থাকা যে নিতান্ত অসম্ভব একথা বলা বাহুল্য। সে সময়ে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, ইন্দ্র প্রভৃতি প্রত্যক্ষগোচর প্রাকৃত পদার্থের আরাধনাই প্রচলিত ছিল। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: উপ. ৭৪)

খাদ্যের অভাব, বিপদ ও দুঃখ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করতো, কালক্রমে ঐসব শক্তিকে তারা মানব ধর্মাক্রান্ত সচেতন দেবতা হিসেবে ভাবতে শুরু করে এবং এখনও তাই চলছে।বেদে যে সকল দেবতার নাম পাওয়া যায় প্রায় সবই নৈসর্গিক। পরবর্তীকালের বহু দেবতাই বেদে অনুপস্থিত। পৌরাণিক যুগে বৈদিক দেবতাদের স্থানের অবনমন ঘটে। বৈদিক দেব বরুণকে হটিয়ে দিয়ে পৌরাণিক ইন্দ্র, দেবতাদের রাজায় পরিণত হয় আবার ভারতবর্ষে আসার পূর্বে হিন্দুদের বর্ণভেদ ছিল না, পরবর্তীকালে বর্ণপ্রথা প্রচলিত হলেও তা বংশ-পরম্পরায় ছিল না বরং গুণ-কর্মানুসারে বর্ণ নির্ধারিত হতো। বৈদিক যুগে নারীর সামাজিক অবস্থাও উন্নত ছিল।

ভারতীয় আর্যরা সিন্ধু নদ অতিক্রম করে পূর্বে ও দক্ষিণে বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্মও প্রসারিত, পরিবর্ধিত হয়। বেদের মন্ত্রে ধর্মের যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে, ব্রাহ্মণভাগে তা জটিলতাপ্রাপ্ত হয়েছে। শাস্ত্রের এই জটিলতা সমাজব্যবস্থার জটিল গঠনের স্মারক। তাই দেখা যায়,

> তাহার (বেদের ব্রাহ্মণভাগে) মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের বিষয়ই সুস্পষ্ট লিখিত আছে। প্রথমোক্ত তিন বর্ণ আর্য্য-বংশীয়; শূদ্রেরা অনার্য্য। ... ভারতবর্ষের পূর্ব্বনিবাসী ঐ দস্যু বা দাসদিগের মধ্যে যাহারা মহাবল পরাক্রান্ত আর্য্যগণ কর্তৃক পরাভূত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করে, তাহারাই শূদ্র বোধ হয়। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: উপ. ৯৮-৯৯)

ব্রাহ্মণভাগের পরে রচিত কল্পসূত্রে দেখা যায় ধর্মীয় আচার-প্রণালীর সুশৃঙ্খল বিন্যাস। হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ঈশ্বরপ্রণীত তবে কল্পসূত্র ও যাবতীয় শাস্ত্র মানবরচিত। ভারতবর্ষীয় আর্যেরা যখন 'ধন-প্রাণের বিঘ্ন-ভয়' থেকে মুক্তি লাভ করে তখন তারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং সেই বিশ্ব-কারণের স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী হয়, যার নিদর্শন উপনিষদগুলি। অক্ষয়কুমার জানিয়েছেন সাকল্যে উপনিষদের সংখ্যা ১৫৪। উপনিষদ প্রণেতাদের অনুধ্যান ও প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা এবং পরিশ্রমের ফসল হলেও উপনিষদে বুদ্ধি-যুক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন,

> উপনিষৎ-প্রণেতা প্রাচীন পণ্ডিতেরা পূর্বোক্ত রূপ অনেকানেক বচনে পরমার্থ-চিন্তনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে বুঝি কেবল এই অনূক্ত দুইটি কথা সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। (১)– যাঁহারা এই অদ্ভুত জগতের অদ্ভুত কারণের অদ্ভুত স্বরূপ নির্দেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাতে কল্পিত গুণ ও কল্পিত স্বরূপ আরোপ করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানান্ধ। (২)– যাঁহারা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-স্বরূপ বিশ্ব-কারণকে বিজ্ঞাত ও বিজ্ঞেয়-স্বরূপ বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপ অপ্রকৃতবাদী।(অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: উপ. ১১৪-১১৫)

উপনিষদ-বক্তারা বেদবাদীদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে এবং বেদকে নিকৃষ্ট বিদ্যা বলে অভিহিত করেছে। এতে অনুমান করা সহজ হয় যে বৈদিক আচার থেকে ধর্ম ক্রমশ লোকায়ত সংস্কৃতির দিকে যাত্রা করেছে। এক্ষেত্রে বৈদিক থেকে পৌরাণিক হয়ে কিভাবে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাসক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে, অক্ষয়কুমার দত্ত সেসবের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছেন।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদের পর ভারতীয় দর্শনের আলোচনা করেন। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত– এই ছয় প্রকার দর্শন প্রাচীন ভারতে জগৎ ও জীবনের পরমার্থ তত্ত্বানুসন্ধানের সাক্ষ্য প্রদান করে। সাঙ্খ্য দর্শনের আলোচনায় অক্ষয়কুমার দেখিয়েছেন, মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত এই দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্যের তলস্পর্শ করতে গিয়ে কপিল প্রকৃতি-পুরুষ নামে দুইটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করেছেন। প্রকৃতি অচেতন অর্থাৎ জড়, পুরুষ চেতন-স্বরূপ। প্রকৃতি চেতনাপ্রাপ্ত হয়ে রূপান্তরিত হয়, আর এভাবেই বিশ্বব্যাপার সৃষ্টি হয়েছে। অক্ষয়কুমার বলেন,

> সাঙ্খ্য-শাস্ত্রকার ঐ প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি পঁচিশটি পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার নাম তত্ত্ব রাখিয়াছেন। ... এই দর্শনে ঐ পঁচিশটি তত্ত্বের সংখ্যা আছে, এই নিমিত্ত ইহা সাঙ্খ্য দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: উপ. ৬)

সাঙ্খ্য দর্শন অনুযায়ী মানুষের ত্রিবিধ দুঃখ– আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। মানুষকে এই তিন ধরনের দুঃখ থেকে মুক্ত করাই সাঙ্খ্য দর্শনের উদ্দেশ্য। বিবেক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভেই কেবল এই দুঃখ থেকে মুক্তি মেলে।সাঙ্খ্য দর্শনের পর পতঞ্জলি মুনি প্রবর্তিত পাতঞ্জল দর্শন আলোচিত হয়েছে। এ দর্শনের সঙ্গে সাঙ্খ্য দর্শনের বিভিন্ন মিল থাকলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব এখানে অস্বীকৃত হয়নি। তাই ঈশ্বরসহ এখানে তত্ত্বের সংখ্যা ২৫টি এবং এ দর্শন অনুযায়ী, ঈশ্বরের সত্তা স্বীকারপূর্বক যোগাভ্যাসের মাধ্যমে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে। সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল দুই দর্শনেই বেদের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে।

বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক ঋষি কণাদ; তিনি পদার্থের পরমাণুর ধারণা দেন। কণাদের মতে পরমাণু নিত্য কিন্তু পরমাণুর সমষ্টি অবয়বসম্পন্ন দ্রব্য অনিত্য। তিনি আরো জানান পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ থাকে আর এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। পরমাণুর বিশেষ পদার্থের জন্য এই দর্শন বৈশেষিক নামে চিহ্নিত হয়েছে। কণাদ সমগ্র দর্শন আলোচনায় ঈশ্বরের নাম করেননি, তিনি বলেছেন পরমাণুপুঞ্জের সংযোগে জড়ময় জগতের উৎপত্তি হয়েছে। এ দর্শন অনুযায়ী দুঃখ নিবৃত্তির নাম মুক্তি আর মুক্তিই পরম পুরুষার্থ এবং যোগাভ্যাসের মাধ্যমে শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক ছিন্ন হলেই মুক্তিলাভ হয়।

ন্যায় দর্শনের জনক মহর্ষি গৌতম, তিনিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। এ দর্শনে বৈশেষিকের পরমাণুবাদ অঙ্গীকার করা হয়। ন্যায়দর্শন মূলত তর্কশাস্ত্র তাই বিচার প্রণালীর সাহায্যে ব্রহ্মা-সৃষ্টির রহস্য এতে উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রমাণ, প্রমেয় ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে শরীর ও আত্মার পৃথকত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের মুক্তিলাভ ঘটে বলে এ দর্শন বিশ্বাস করে। পুরোপুরি বেদের প্রভাবমুক্ত না হলেও, "একদিকে বেদ ও বেদান্ত, অপর দিকে বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক শাস্ত্র, গৌতম ও কণাদ দর্শন ঐ উভয়ের মধ্যবর্তী।" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: উপ. ২৭)

মীমাংসা দর্শনের জনক মহর্ষি জৈমিনি, শ্রুতিশাস্ত্রের অর্থ নির্ণয় এবং শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ নিরসন এই দর্শনের লক্ষ্য। এই দর্শন অনুযায়ী স্বর্গভোগই পরম পুরুষার্থ, বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞের মাধ্যমে সেই পুরুষার্থ অর্জন করা যায়, তবে এই দর্শনও প্রকৃতবিচারে নাস্তিক্যবাদী। জৈমিনির মতে বেদ নিত্য, অপৌরুষেয়। তবে বিজ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রভাবে জৈমিনির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার অবস্থান নিয়েছিলেন।মীমাংসা দর্শনকে অনেকে কর্ম-মীমাংসা বলে থাকেন, এর বাইরে আছে ব্রহ্ম-মীমাংসা যার সাধারণ নাম বেদান্ত। এই দর্শন অনুযায়ী, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি,

ভঙ্গ যাতে হয় তিনিই ব্রহ্ম। বেদান্ত অনুযায়ী পরব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ তবে তিনি নিজে রূপান্তরিত বা বিকৃত হয়ে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়; জগৎ সৃষ্টিই হয়নি বরং বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র। বেদে এ মতের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না তবে উপনিষদই এর প্রধান প্রমাণ। বেদান্তসূত্র এ দর্শনের আদি গ্রন্থ। পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য এই দর্শনকে মায়াবাদ নামে অভিহিত করেন। ধারণা করা হয়, এর নেপথ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান করাকে এ দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান বলা হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলেই মুক্তি সম্ভব, এই মুক্তিকে নির্বাণমুক্তি বলে।

ষড়দর্শনের প্রায় সবগুলোই প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নাস্তিক্যবাদী, একথা না জেনেই অনেক আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এসব দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে থাকে। ষড়দর্শনের বাইরে আরও যেসব দর্শন আছে সেগুলো বেশিরভাগই নাস্তিক্যবাদী, অক্ষয়কুমার চার্বাক দর্শনের নাম উল্লেখ করেছেন। এসব দর্শনের বাইরে অনেক সম্প্রদায়-প্রবর্তকও কিছু কিছু নব্য দর্শনের জন্ম দিয়েছেন।

এরপর অক্ষয়কুমার মানব ধর্মশাস্ত্র ও রামায়ণ-মহাভারতের আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্রে উল্লেখিত জ্ঞানচর্চা ও যোগাবলম্বন উচ্চ স্তরের সাধকদের দ্বারাই সম্ভব, সাধারণ লোকের পক্ষে নয়। তাই সেই সাধারণ মানুষগুলো সাকার দেবতার উপাসনা ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়,মনুসংহিতায় এর উল্লেখ আছে। মনুসংহিতা রচনাকালে ভারতীয় হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং এই বর্ণ ও বর্ণসংকরসমূহের নানা প্রকার জীবনবৃত্তি প্রণালীবদ্ধ হয়ে গেছে।ব্রাহ্মণেরা এসময় ধর্মের রক্ষক হিসেবে সমাজে প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে ওঠে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চার যুগ ও কল্পবিভাগ এই সময়েই প্রবর্তিত হয়। এই সময়ের বিবাহপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ও বাল্যবিবাহের অনুপস্থিতির কথা জানান। এমনকি মদ্যপান ও গো-মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায়ও পরব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাকেই পরিশুদ্ধ ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পূর্বে প্রচলিত দর্শনশাস্ত্র স্বীকরণ করেই মনুসংহিতা গড়ে ওঠেছে এবং মনুসংহিতা রচনাকালে বেদ-বিরুদ্ধ নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধমতও প্রচলিত ছিল। এই সময়ে সমাজে একটা সংশ্লেষণ চলছিল, বৈদিক ধর্ম ও উপাখ্যান যেমন প্রচলিত ছিল পাশাপাশি পৌরাণিক ধর্ম ও উপাখ্যানের মাধ্যমে পৌরাণিক দেবতাদের অধিষ্ঠান ঘটছিল। অক্ষয়কুমার বলেন, "হিন্দুধর্ম্মের উল্লিখিত অবস্থায় যেমন বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক ব্যবহারের প্রচার ছিল, সেইরূপ আবার পৌরাণিক অথবা ইদানীন্তন ধর্ম্ম ও ব্যবহারেরও সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়।" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯ : উপ. ১৬০)

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিব ও বিষ্ণু পরস্পর পরমেশ্বর পদে অধিষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে রামায়ণ সর্বপ্রাচীন হিসেবে স্বীকৃত, যদিও আদি

রামায়ণে রাম বিষ্ণুঅবতার নয়, সাধারণ মানুষ। রামোপাখ্যান মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল ফলে অনেক নতুন বিষয় সেখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়; একথা মহাভারতের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। রামায়ণ বর্ণিত আখ্যানের সময় থেকে আর্য উপনিবেশ বিস্তারের সূত্রপাত ঘটে এবং মহাভারতের যুগে আর্যধর্ম ও আর্যসভ্যতা ভারতের অধিকাংশ স্থানেই বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আবার রামায়ণে তেত্রিশটি দেবতার উল্লেখ রয়েছে, যা মূলত বৈদিক দেবতা; এছাড়া যাগ-যজ্ঞ, বিবাহ-পদ্ধতি, সন্তান জন্মদান প্রভৃতি কর্মের মধ্যে বৈদিক প্রভাব বিদ্যমান। পুরাণসমূহে দেবতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় তেত্রিশ কোটিতে এবং বৈদিক দেবতাদের স্থানের অবনমন ঘটে। রাম ও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব এ সময়েই প্রতিপাদিত হয়।

পূর্বতন ঘটনার বিবরণকে পুরাণ হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং মহাপুরাণ ও উপপুরাণ মিলিয়ে সংখ্যা পাওয়া যায় ৩৬টি; যদিও এগুলোর প্রাচীনত্ব নিয়ে সংশয় প্রচুর কেননা মহাভারত সঙ্কলিত হবার পূর্বেও পুরাতন ঘটনাবিষয়ক গ্রন্থ পুরাণ ও ইতিহাস নামে প্রচলিত ছিল বলে অক্ষয়কুমার অনুমান করেছেন। এছাড়া উপনিষদে "বেদের অন্তর্গত দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতির নাম ইতিহাস, আর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বিবরণের নাম পুরাণ।" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯ : উপ. ১৬০)

দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে সকল পুরাণ একই সময়ে রচিত হয়েছে এমনটি বলার উপায় নেই, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও বিভিন্ন পুরাণ বা পুরাণের অংশবিশেষ রচিত হয়েছে বলে অক্ষয়কুমার মতামত জানিয়েছেন। যেমন পদ্মপুরাণে শৈব-বৈষ্ণবের বিবাদসূচক নানা ঘটনার উল্লেখ দেখে অক্ষয়কুমার অনুমান করেন, তা একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছে। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধা-কৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গের উপস্থিতি এবং মানুষের ম্লেচ্ছাচার অবলম্বনের উল্লেখ দেখে অক্ষয়কুমার এই পুরাণকে ভারতবর্ষে ইসলাম বিজয়ের পরবর্তীকালীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার কূর্মপুরাণে তন্ত্র ও কলিযুগের সুস্পষ্ট উল্লেখ এর আধুনিকত্বের প্রমাণ বহন করে, কেননা "তন্ত্রের বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অপেক্ষা বড় অধিক হওয়া সম্ভব নয়" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯ : ১৮৩) এবং বেশিরভাগ তন্ত্র বাংলায় বিশেষ করে পূর্ববাংলায় উদ্ভূত বলে অক্ষয়কুমার মনে করেন। আবার বিষ্ণুপুরাণে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নিন্দা-বিদ্বেষ দেখে এটি ঐসব ধর্মের আবির্ভাবের পরে রচিত বলে সহজেই অনুমেয়। এছাড়া ম্লেচ্ছ রাজবংশের উল্লেখ থেকে অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন "এই ম্লেচ্ছ শব্দ মোসলমান হওয়াই সম্ভব।" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯ : ১৮৮) যদি তাই হয় তাহলে এই পুরাণও মুসলমান বিজয়ের পরে রচিত। পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের অভিমত,"যে সময়ে ঐ ধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম) এখানে সমধিক ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময়ে ও তাহারও উত্তরকালে পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাই।" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: ১৯২) বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে

ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্ম ক্ষীণতর হতে থাকে এবং দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পায় এবং হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। শংকরাচার্য, রামানুজ প্রমুখের দ্বারা হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন কার্য গতিপ্রাপ্ত হয়, এক্ষেত্রে তৎকালে রচিত পুরাণগুলো তাঁদের সহায় হয়ে ওঠে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় "স্বধর্ম্মানুরক্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব মতানুযায়ী ধর্ম্ম-প্রণালী-প্রচলন উদ্দেশে তাঁহার নামে সেই সমস্ত প্রচার করা হইয়াছে।" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: ১৯৫)

বিভিন্ন পুরাণে পরস্পর বিরুদ্ধ মত, নিন্দা-বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে, যা সাম্প্রদায়িক বিরোধের নিদর্শন। শৈব-বৈষ্ণবের বিরোধ এ সময়ে প্রবল হতে থাকে। শৈব ও বৈষ্ণব উপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্তকগণ প্রচলিত প্রবচন এবং স্বসম্প্রদায়ের উপযোগী বিভিন্ন বিষয় সংযুক্ত করে পুরাণের অভিনব রূপ দিয়েছেন। এভাবে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন দেবতার প্রাধান্য বর্ণিত হয়েছে, এক কর্তৃক অন্যের উপাস্যের মহিমা খর্ব হয়েছে। তবে এমনও অনেক শাস্ত্রকার ছিলেন যারা সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছেন এই বলে যে, যিনি ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর।

কৃষ্ণোপাসনা সম্পর্কে অক্ষয়কুমার বলেন, বেদে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ পাওয়া যায় না; উপনিষদে কৃষ্ণের নাম থাকলেও সেই কৃষ্ণ পরমেশ্বর বা প্রধান দেবতা নন। মহাভারতেও কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার হিসেবে পুরোপুরি স্বীকৃত নন। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণকে পরমেশ্বর বিষ্ণু বলে অভিহিত করা হলেও অন্যান্য বিষ্ণু-প্রধান পুরাণে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অংশাবতার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অক্ষয়কুমার নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন, যেখানে হিন্দুধর্মের মতো যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই বরং দান, দয়া, ন্যায় ও সত্য প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ অবলম্বনে অধ্যাত্মজ্ঞান এবংধ্যানযোগে নির্বাণ লাভের কথা বলা হয়েছে। বেদ ও বর্ণবিভাজনে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবকে অক্ষয়কুমার বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করেছেন। মহান সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে এ ধর্মের প্রসারে গতি সঞ্চার করেন। তবে ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই ধর্ম পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে; বৌদ্ধধর্ম বিকাশের এক পর্যায়ে বৈদিকধর্ম অনেকটা ম্লান হয়ে গেলেও কালের বিবর্তনে হিন্দুধর্মের কাছে পরাজিত হয়ে যায় বৌদ্ধধর্ম। পরবর্তীকালে নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধধর্মেও প্রতিমাপূজার প্রচলন ঘটে এমনকি তন্ত্রও যুক্ত হয় আবার হিন্দুধর্মও বৌদ্ধধর্ম দ্বারা নানা বিষয়ে প্রভাবিত হয়েছে। মায়াবাদ, নির্বাণমুক্তি, অহিংসা ধর্ম প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা; এমনকি গৌতম বুদ্ধও হিন্দুদের দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

বাংলার অধিকাংশ মানুষ শাক্ত তাই শাক্তধর্মের বিবরণ অপেক্ষাকৃত সহজে সংগ্রহ করা গেলেও অক্ষয়কুমারের পক্ষেশৈবদের বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। তিনি ১৪০০

শৈব উপাসকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ সম্প্রদায়ের বিবরণ তৈরি করেন। বৈষ্ণব উপাসকদের বৃত্তান্তও একই প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত হয়েছে। *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* প্রথম ভাগে অক্ষয়কুমার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয় ভাগে শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচয় তুলে ধরতে অক্ষয়কুমার ক্ষেত্র সমীক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করে সমগ্র ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ তুলে ধরেছেন।

উনিশ শতকের ভারতবর্ষে অক্ষয়কুমার বৈষ্ণবদের চারটি সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন, যথা- রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য এবং নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়। বৈষ্ণবের বাকি সম্প্রদায়গুলো এই চারটি সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ। বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাদের সম্প্রদায়ের প্রামাণিকতার জন্য পদ্মপুরাণ ও গৌতমীয় তন্ত্রের বচন উল্লেখ করেন। শিবোপাসক শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে দশনামী, যোগী, অবধূত, নাগা, দণ্ডী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবল ও ব্যাপক-বিস্তৃত হলেও শৈব সম্প্রদায়ের বিস্তৃতিও কম নয়। ঐতিহাসিক দিক থেকেও শৈব ধর্ম, বৈষ্ণব অপেক্ষা প্রাচীনত্বের দাবীদার কেননাশূদ্রক ও কালিদাসের রচনায় শিবোপাসনার উল্লেখ রয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে শংকরাচার্য কর্তৃক শৈব ধর্ম গতিপ্রাপ্ত হয় এবং সন্ন্যাসধর্মের পুনঃপ্রবর্তন ঘটে।

৩.১

যেকোনো উপাসক সম্প্রদায়ে প্রবেশের জন্য দীক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক, এক্ষেত্রে গুরু বিভিন্ন মন্ত্রের মাধ্যমে শিষ্যদের দীক্ষা দিয়ে থাকেন। যেমন রামানুজ সম্প্রদায়ে 'ওঁ রামায় নমঃ' মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয় আবার রামাৎ বৈষ্ণবেরা 'শ্রীরাম' মন্ত্রে দীক্ষা নেয়। কর্তাভজা সম্প্রদায় দীক্ষা নেয় 'গুরু সত্য' মন্ত্রে। কিছু কিছু সম্প্রদায়ে আবার শিষ্যভেদে ভিন্ন মন্ত্র প্রদান করা হয়, যেমন-সাহেবধনী সম্প্রদায়ে হিন্দু শিষ্যকে 'ক্লীং দীননাথ দীন-বন্ধু' এবং মুসলমান শিষ্যকে 'দীনদয়াল দীনবন্ধু' মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়। শৈব উপাসকেরা বিভিন্ন বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। একাক্ষর মন্ত্র 'হৌঁ', ত্র্যক্ষর মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র 'ও জুঁ সঃ', চতুরক্ষর চণ্ডমন্ত্র 'ঊর্ধ্বফট্', পঞ্চাক্ষর মন্ত্র 'নমঃ শিবায়', ষড়ক্ষর মন্ত্র 'ওঁ নমঃশিবায়' প্রভৃতি মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে থাকে। অবধূত সম্প্রদায় সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নতুন নামের সঙ্গে গিরি, পুরি, ভারতী, বন, অরণ্য, পর্বত, সাগর এই উপাধিগুলোর যেকোনো একটি গ্রহণ করে। অঘোরীরা অঘোর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। শাক্ত তান্ত্রিক উপাসকেরা কালীবীজ, ভুবনেশ্বরী বীজ প্রভৃতি বিভিন্ন বীজমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে থাকে।

৩.২

ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রায় সবই গুরুবাদী সম্প্রদায়। গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েই সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হয়। রামানুজ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কারো দীক্ষা-গুরু

পদে বৃত হবার অধিকার নেই তেমনি মধ্বাচারী সম্প্রদায়েও সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কারো দীক্ষা গুরু হবার অধিকার নেই।

আবার কিছু কিছু সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু এসেছেন নিতান্তই অন্ত্যজ শ্রেণি থেকে, যেমন– কবীরপন্থী সম্প্রদায় প্রবর্তক কবীর ছিলেন জাতিতে জোলা বা তাঁতি। আবার রয়দাসী উপাসক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রয়দাস ছিলেন একজন চামার। সেনপন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন জাতিতে নাপিত। মলূকদাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মলূকদাস বণিকের সন্তান ছিলেন। আবার দাদূপন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক দাদূ ছিলেন একজন ধুনুরি। বলরামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলরাম জাতিতে হাড়ি ছিলেন। এছাড়া উড়িষ্যায় প্রান্তিক শ্রেণির কিছু বৈষ্ণব আছে যারা কালীন্দী বৈষ্ণব নামে পরিচিত, এরা অন্ত্যজ শ্রেণিকে দীক্ষা দিয়ে থাকে। হরিশ্চন্দী ও সদ্ধপন্থী সম্প্রদায়ও অন্ত্যজ লোকের দ্বারা প্রবর্তিত এবং অন্ত্যজ লোকেরাই এ সমাজে প্রবিষ্ট হয়।

সম্প্রদায় ভেদে গুরু পদপ্রাপ্তি এবং আচার-ব্যবহারে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। রামাৎ বৈষ্ণবের গুরু অর্থাৎ মহন্ত চেলা-শিষ্যদের নিয়ে মঠে অবস্থান করেন। মহন্তের মৃত্যুর পর তার সন্তান অথবা বিভিন্ন মঠের অধ্যক্ষদের দ্বারা নতুন মহন্ত নির্বাচিত হন। রামসনেহী সম্প্রদায়ের গুরুদের বলা হয় বৈরাগী ও সাধ। তাঁরা গৈরিক মাটিরঞ্জিত কার্পাসের কাপড় পরে এবং কাঠের পাত্রে জল, পাথর ও মাটির পাত্রে খাবার গ্রহণ করে। এ সম্প্রদায়ে নারীরাও ধর্মগুরু হতে পারে।

কোনো কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা গুরুর উপাসনা চলে অথবা গুরুকে উপাস্য দেবতার অবতার বলে বিশ্বাস করা হয়। কণ্‌ফট্ যোগী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গোরক্ষ নাথ, শিষ্যেরা তাঁকে শিবাবতার হিসেবে বিশ্বাস করে। এদিকে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যিনি গুরু তিনিই শ্রীকৃষ্ণ এবং শিষ্যেরা শ্রীমতী রাধিকাস্বরূপ। আবার চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রবর্তক এবং উপাস্য শ্রী চৈতন্যদেব। এ সম্প্রদায় দেব, গুরু ও মন্ত্রের অভেদ জ্ঞান করে। বংশপরম্পরায় গুরু পদপ্রাপ্তি ঘটে ফলে অনেকসময় গুরুদের আধিপত্য শিষ্যদের জীবনে দুর্যোগ হয়ে নেমে আসে। আবার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু অর্থাৎ মহাশয়দের মধ্যে মাঝে মাঝে শিষ্যাধিকার নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়।

অবধূত শৈব সম্প্রদায়ে দীক্ষা গুরু ছাড়াও অন্য গুরুর অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং গুরুভক্তি এদের প্রধান কর্ম। একাধিক গুরুর অস্তিত্ব যেমন আছে তেমনি আবার কোনো কোনো সম্প্রদায়ে গুরুপ্রণালী অগ্রাহ্য করা হয়, যেমন- সাহেবধনী সম্প্রদায়ে বিগ্রহ ও মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয়।

৩.৩

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকেরা ধর্মকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করে কেউ উদাসীনের জীবন বেছে নেয় কেউবা গৃহস্থ জীবনেই উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। তাই দেখা যায় রামানুজ

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস বাধ্যতামূলক নয় এবং রামাৎ বৈষ্ণবদের মধ্যে সন্ন্যাসী ও গৃহী দুইই দেখা যায়। একই কথা প্রযোজ্য চৈতন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও, এ সম্প্রদায়ে বৈরাগীদের ভেকধারী বলা হয়। এছাড়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বনকারী বৈষ্ণবও দেখা যায়। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রবিশেষে বৈরাগী, অবধূত, পরমহংস, দণ্ডী প্রভৃতি নাম রয়েছে।

শৈব উপাসকেরা প্রায় সকলেই সন্ন্যাসী, শৈব গৃহস্থ কমই দেখা যায়। দশনামী সন্ন্যাসীরা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও সাধনপথ অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয়, যথা-দণ্ডী, পরমহংস প্রভৃতি। দণ্ডী উপাসকদের জন্য সন্ন্যাস বাধ্যতামূলক হলেও ঘরবারী দণ্ডী বলে এক শ্রেণির উপাসক আছে যারা গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করে।

আচারী সম্প্রদায়ের গুরু-শিষ্য উভয়কেই ব্রাহ্মণ হতে হয় আবার মধ্বাচারী সম্প্রদায়েও অন্ত্যজদের শিষ্য করা হয় না। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেউ শিষ্য হতে পারে না এবং শিষ্যদের উপর গোস্বামীদের তীব্র প্রভুত্ব দেখা যায়। শিষ্যরা দেহ-মন-প্রাণ গুরুর কাছে সমর্পণ করে দেবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেউ শৈব দণ্ডী হতে পারে না এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কারো খাদ্য এরা গ্রহণ করে না। তবে অবধূত শৈব সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কেউ প্রবিষ্ট হতে পারে।

সম্প্রদায়ভেদে শিষ্য করার নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন; দঙ্গলী শৈবরা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় এবং বালক ক্রয় করে শিষ্য করেন। আবার নাগা সন্ন্যাসীরা নিজেরা শিষ্য করে না, অন্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায় থেকে লোক এসে তাদের দলভুক্ত হয়।

৩.৪

আখড়া বা মঠ মূলত গুরুদের বাসস্থান, গুরু তাঁর শিষ্য-চেলাদের নিয়ে সেখানে অবস্থান করেন। সম্প্রদায় ভেদে আখড়ার ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। রামানুজ সম্প্রদায়ের অসংখ্য আখড়া বিদ্যমান, শিষ্যানুক্রমে আচার্যগণ আখড়ার গদির অধিকারী হয়ে থাকেন। রামাৎ বৈষ্ণবদের সাতটি মূল আখড়া বা মঠ আছে; নির্বাণী, খাকী, সন্তোষী, নির্মোহী, বলভদ্রী, টাটম্বরী ও দিগম্বর। মলূকদাসী সম্প্রদায়ের ৬টি মঠ দেখা যায়।

শৈব দণ্ডী উপাসকেরা কেবল মঠে অবস্থান করে কিন্তু অবধূত সম্প্রদায় মঠ এবং আখড়া দু জায়গাতেই অবস্থান করে বৈষ্ণবদের মতো এদেরও সাতটি আখড়া-নিরবাণী, নিরঞ্জনী, অটল, আহ্বান, যূনা, আনন্দ ও বড় আখাড়া।

৩.৫

প্রত্যেক উপাসক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক চিহ্ন, সজ্জা এবং অভিবাদনসূচক শব্দ রয়েছে। সাধারণত বৈষ্ণবেরা তিলক এবং শৈবরা বিভূতি ধারণ করে। এছাড়া সম্প্রদায়ভেদে অন্যান্য চিহ্নও ধারণ করতে দেখা যায়। অক্ষয়কুমার বলেন,

> বৈরাগীরা নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত ঊর্ধ্বরেখা করেন, আর শৈবেরা ললাটের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিভূতি দিয়া তিনটী রেখা করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত তিলককে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ও শেষোক্ত তিলককে ত্রিপুণ্ড্র বলে। (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: ২১)

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান সাম্প্রদায়িক চিহ্ন তিলক, তবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের তিলকের আকার বিভিন্ন রকম হতে দেখা যায় অর্থাৎ "তিলক সেবা অথবা ব্যবহার বা বৃত্তি-বিশেষের প্রভেদ প্রযুক্ত নানা প্রকার বৈষ্ণব হইয়া উঠিয়াছে।" (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮ : ২৩১) রামানুজ সম্প্রদায়ে নাসামূল থেকে কেশ পর্যন্ত দীর্ঘ তিলক সেবার বিধান রয়েছে। এছাড়া তারা গোপীচন্দন ও অন্যান্য মাটি দিয়ে নানারূপ চিহ্ন এবং উত্তপ্ত ধাতব মুদ্রার চিহ্ন শরীরে অঙ্কন করে থাকে। এরা গলায় তুলসীর মালা ধারণ করে। রামাৎ বৈষ্ণবেরা পরস্পরকে 'জয়শ্রীরাম', 'জয়রাম' বা 'সীতারাম' বলে অভিবাদন করে। এদের তিলক রামানুজদের চেয়ে কিছু ছোট। কবীরপন্থীরা তুলসীমালা ও তিলক ধারণ করলেও বাহ্য আড়ম্বর অপেক্ষা অন্তঃশুদ্ধিই তাদের প্রধান লক্ষ্য। দাদূপন্থীরা তিলকসেবা ও মালা ধারণ করে না, শুধু একটি জপমালা সঙ্গে রাখে। এছাড়া স্বহস্তে প্রস্তুতকৃত টুপি পরতে হয় তাঁদের। ন্যারা সম্প্রদায়ের উপাসকেরা ক্ষৌরীকর্ম করে না, গায়ে আলখেল্লা, মাথায় টুপি এবং ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়; মুখে 'হরিবোল' অথবা 'বীর অবধূত' বলে থাকে। সখীভাবক সম্প্রদায় নারীর বেশভূষা, নাম ও ব্যবহার অবলম্বন করে উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। বৈরাগী বৈষ্ণবেরা লাউ বা কাঠের তৈরি কমণ্ডলু এবং মৃগচর্ম ও লোহার তৈরি চিমটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কামধেম্বী সম্প্রদায় ভিক্ষার সময় কামধেনু নামক বাঁক কাঁধে নিয়ে ভিক্ষা করে আবার মটুকাধারী বৈষ্ণবেরা বৃহৎ মাটির পাত্র সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষায় বের হয়।

বৈষ্ণব এবং শৈব সম্প্রদায়ের মূল পার্থক্য তিলকে। শৈব সম্প্রদায় শরীরে বিভূতি লেপন ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করে তবে সকল শৈব একই ধরণের চিহ্ন ধারণ করে না। দণ্ডী সন্ন্যাসীরা মস্তকমুণ্ডন ও শ্মশ্রু পরিত্যাগ করে গেরুয়া বস্ত্র পরে এবং বিভূতি ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করে। দণ্ড ও কমণ্ডলু সঙ্গে নিয়ে তাঁরা ভ্রমণ করে। আবার অবধূত সন্ন্যাসীরা জটা ও শ্মশ্রু ধারণ করে। এছাড়া তাঁরা ডোর, কৌপিন, বিভূতি ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করে এবং গেরুয়া বস্ত্র পরে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়। পরস্পর সাক্ষাৎ হলে এরা 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাধন করে। শৈব নাগা সম্প্রদায় মাথার জটা রশির মতো পাকিয়ে মুকুটের মতো বেঁধে রাখে এবং শরীরে কোনো বস্ত্র রাখে না। আলেখিয়া সম্প্রদায়ের উপাসকেরা বাম হাতে ঝুলি ও খর্পর এবং ডান হাতে চিমটা নিয়ে বিভূতি-রুদ্রাক্ষ ধারণ করে ঘুঙুরের শব্দ করতে করতে ভিক্ষা করে। এদিকে অঘোরী সম্প্রদায় অস্থি ও নর-কপালযুক্ত লাঠি সঙ্গে রাখে। কণ্‌ফট যোগীদের দুই কানে বৃহৎ ছিদ্র থাকে এবং সেই ছিদ্রে পাথর, বেলোয়ার অথবা গণ্ডারের শিং দ্বারা তৈরি করা কুণ্ডল ধারণ করে। এছাড়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে মাথায় জটা, শরীরে ভস্ম, কপালে বিভূতি ধারণ করে। অঘোরপন্থী যোগী

সম্প্রদায় মদ, মাংস, সাপের অস্থি ও বিভিন্ন পশুর কপাল ধারণ করে; এরা কানে কুণ্ডল পরে এবং গলায় হাড়ের, করোটির ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করে। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় ক্ষুদ্রাকৃতি শিবলিঙ্গ হাতে ও গলায় ধারণ করে।আবার এমনও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছে যারা মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহেই অবস্থান করে, সন্ন্যাসীর কোনো চিহ্ন ধারণ করে না; এদের মানস সন্ন্যাসী বলা হয়।

৩.৬

অক্ষয়কুমার জানিয়েছেন, সম্প্রদায় প্রবর্তকেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে প্রমাণসিদ্ধ করার জন্য প্রচলিত শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন বচন উপস্থাপন করেন এবং এ সকল শাস্ত্রকে নিজেদের প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে শ্রদ্ধা করেন। আবার সম্প্রদায় প্রবর্তনের পর উপাসকদের জন্য নির্দেশনাসুলভ যে গ্রন্থ রচিত হয় সেগুলোকে বলা হয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ; সাধারণের বোধ্যগম্য করার জন্য বেশিরভাগ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আঞ্চলিক ভাষায় লেখা। রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ হলো বেদার্থ-সংগ্রহ, বেদান্ত-সার, বেদান্ত-প্রদীপ, গীতা-ভাষ্য, রামানুজকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য। এছাড়া বিষ্ণু, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম, বরাহ ও ভাগবত পুরাণকে তাঁরা স্বীকার করে থাকে এবং দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ভাষায় লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ এ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়। রামাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রসমূহ সর্বসাধারণের বোধগম্য করার মানসে আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত হয়েছে। কবীরপন্থীদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ মূলত কবীরের শিষ্যদের দ্বারা হিন্দি ভাষায় রচিত। এসব গ্রন্থের নিগূঢ় ভাব অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তাকারে সাংকেতিক ভাষায় লিখিত। মলূকদাসীদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থও হিন্দি ভাষায় লেখা। এদের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ ভগবদগীতা। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের সার সংগ্রহ করে লিখিত *বিশ্বাস কা অঙ্গ* দাদূপন্থীদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। আবার রামসনেহী সম্প্রদায় প্রবর্তক ও মহন্তগণ বিভিন্ন শ্লোক রচনা করেছেন যা তাঁদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বল্লভাচার্যকৃত শ্রীভাগবতের টীকা এবং এ সম্প্রদায়ে পণ্ডিতদের জন্য সংস্কৃত গ্রন্থ এবং সাধারণের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ রয়েছে। চৈতন্য সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লেখা অবশ্য সংস্কৃত ভাষায়ও প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়েছে। মহাপুরুষীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সাধারণের বোঝার জন্য সাধুভাষা ও ব্রজভাষামিশ্রিত আসামী ভাষায় লেখা হয়েছে।

সনকাদি সম্প্রদায় বা নিমাৎ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক কোনো গ্রন্থ নেই, আবার অনেক সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের পরিবর্তে আছে বিভিন্ন গান। বাউলের গুহ্য দেহসাধনার নিয়মাবলি গানের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় ধরা আছে। এছাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মসঙ্গীত সম্পর্কে অক্ষয়কুমার বলেন,

> সে সমুদায় অশিক্ষিত ইতর লোকের কৃত এ প্রযুক্ত উৎকৃষ্ট ভাষায় রচিত হয় নাই বটে, কিন্তু তৎপাঠ দ্বারা এ সম্প্রদায়ের অনেকানেক নিগূঢ় ভাব অবগত হওয়া যাইতে পারে। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮ : ১৯৮)

আবার শাক্ত-তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্র গুহ্য হওয়ায় বিভিন্ন সাংকেতিক ভাষায় সে মন্ত্র রচনা করা হয়েছে, ফলে সে মন্ত্রগুলো দুর্বোধ্য।

৩.৭

বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করে থাকে, উপাস্য দেবতার নাম অনুসারেই সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়। তাই বিষ্ণুর উপাসকদের বৈষ্ণব, শিবের উপাসকদের শৈব, শক্তির উপাসকদের শাক্ত নামে অভিহিত করা হয়। কোনো কোনো উপাসক উপাস্য দেবতার বিগ্রহের উপাসনা করে কেউ আবার নিরাকার উপাসনা করে। রামানন্দী অর্থাৎ রামাৎ বৈষ্ণবেরা রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষণ ও হনুমানের উপাসনা করে থাকে। রামোপাসক বলে এদের নাম রামাৎ। কবীরপন্থীরা কোনো দেবতার উপাসনা বা হিন্দু শাস্ত্রীয় কোনো আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে না। চার্বাক বলে পরিচিত এই সম্প্রদায় আনন্দধর্মকেই বড় বলে মনে করে। মলূকদাসীদের উপাস্য রাম আবার রামসনেহীদের উপাস্যও রাম। যেহেতু রাম পরমেশ্বর তাই অন্য দেবতার উপাসনাকে তারা বাহুল্য মনে করে। আচারী সম্প্রদায় শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধারী বিষ্ণুর উপাসনা করে, এদের অসংখ্য দেবালয় রয়েছে যেখানে মূল্যবান ধাতু নির্মিত বিষ্ণুমূর্তির পূজা হয়। গৌরবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরাঙ্গকে প্রধান বলে মনে করে কারণ তিনি রাধা-কৃষ্ণের যুগলাবতার। এরা শুধু গৌরাঙ্গের বিগ্রহেরই পূজা করে। মহাপুরুষীয় ধর্ম সম্প্রদায় এবং জগন্মোহনী সম্প্রদায় সাকার দেবতার বিগ্রহ পূজা করে না। আবার গুজরাটের স্বামীনারায়ণী সম্প্রদায়কে দেখা যায় গ্রন্থের উপাসনা করতে।

দশনামী শৈব সন্ন্যাসীরা নিজেদের নির্গুণ উপাসক বলে পরিচয় দিলেও তাঁরা শঙ্করাচার্যকে শিবাবতার হিসেবে বিশ্বাস করে এবং সাকার উপাসনাকেও সমর্থন করে। যদিও বেদান্তচর্চা ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান সাধনই দশনামী শৈবদের প্রধান ধর্ম। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে শিবের পার্থক্য হলো, শিব মূর্তি অপেক্ষা লিঙ্গ রূপেই অধিক পূজিত হন। এজন্য লিঙ্গপুরাণ নামে স্বতন্ত্র পুরাণও রচিত হয়েছে। লিঙ্গায়ৎ শৈব সম্প্রদায়ে লিঙ্গোপাসনার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবে নাগা সম্প্রদায়ের উপাসকেরা পুষ্প-চন্দন দিয়ে বিভূতির উপাসনা করে।

শাক্ত উপাসকেরা শিব-শক্তি অর্থাৎ কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবীর উপাসনা করে। শীতলা পণ্ডিতেরা লৌকিক দেবী শীতলার পূজা করে। সৌর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা সূর্য। গাণপত্য সম্প্রদায় উপাস্য গণপতি বা গণেশের আরাধনা করে।

৩.৮

বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিধানে উপাসনা করে থাকে। রামানুজ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীরা পাঁচ প্রকার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, মন্দির ও মন্দিরের পথ পরিষ্কার করে ফুল ও অন্যান্য পূজা দ্রব্য দিয়ে ভগবৎ পূজার পর মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসুক্ত ও স্তোত্রপাঠ, নাম-সঙ্কীর্তন ও রামানুজ-ভাষ্য পাঠের মাধ্যমে উপাসনা সম্পন্ন করে। এছাড়া ধ্যান, ধারণা ও সমাধির মাধ্যমে যোগাবলম্বনে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির সাধনা করে থাকে। রামাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈরাগীরা অনবরত নামজপকেই পূজা মনে করে। কবীরপন্থীদের উপাসনা চলে গানের মাধ্যমে, জপ, পূজা, জাতিভেদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে ভগবৎ প্রেমে চিত্তার্পণ করাই তাদের উপাসনা। শুধু রামনাম জপই দাদূপন্থীদের উপাসনা এবং অহিংসা নীতি অবলম্বন করায় জীব হত্যা করে না; শবদাহ করলে পতঙ্গের প্রাণ বিনষ্ট হতে পারে তাই তাঁরা মৃতদেহ পশু-পাখির আহারের জন্য বনে ফেলে আসে।

রামসনেহীদের উপাসনা মূলত কৃচ্ছ্রসাধনামূলক। সকল প্রকার বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করে জীবনযাপনে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তাঁদের। প্রতিমা নির্মাণ ও প্রতিমাপূজা এদের জন্য নিষিদ্ধ, তবে "তাঁহারা দিনের মধ্যে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে ঈশ্বরের উপাসনা করেন।" (অক্ষয়কুমার,১৮৮৮ : ১০৬)অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের একসঙ্গে উপাসনা করার নিয়ম নেই। ধ্যান, মালাজপ ও রাম-নাম উচ্চারণই এদের সাধনা। রাতের বেলা এরা নিরম্বু উপবাস করে। তারা হিন্দু সমাজে প্রচলিত কোনো উৎসবের অনুষ্ঠান করে না তবে তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট ফুলদোল উৎসব ঘটা করে উদযাপন করে।

মধ্বাচারীরা জীব ও পরমেশ্বরের পৃথক সত্তা স্বীকার করে তাই তাঁরা দ্বৈতবাদী। কপালে তিলক এবং কাঁধে ও বুকে এরা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের চিহ্ন ধারণ করে। নিজের সন্তানদের নাম বিষ্ণুর নামে নামকরণ করে এবং কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভজনের মাধ্যমে উপাসনা সম্পন্ন করে এবং বিষ্ণুর প্রসাদলাভে মুক্তিলাভ করে। এরা বিগ্রহ পূজা ও দেবোৎসব পালন করে এবং এদের মন্দিরে বিষ্ণু ছাড়াও অন্য দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি থাকে।

বল্লভাচারীরা জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে সহজ-সরল নিয়ম সংস্থাপন করে, তাদের মতে গার্হস্থ্যজীবনে থেকেও উপাসনা সম্ভব, কৃচ্ছ্রসাধনা করলেই তপস্যা হয় না। বল্লভাচারীরা কৃষ্ণোপাসক, প্রতিদিন আটবার তাঁরা কৃষ্ণের উপাসনা করে। এছাড়া রথযাত্রা, রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি মহোৎসব উদযাপন করে। চৈতন্য সম্প্রদায় কৃষ্ণের উপাসনা করে, বিধি-ভক্তির পরিবর্তে প্রেমভক্তি ও হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে এদের সাধনা চলে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের আশ্রয়ে প্রেমসাধনা চলে। চৈতন্য সম্প্রদায়ের

শাখা স্পষ্টদায়ক সম্প্রদায়ে নারী-পুরুষ একসঙ্গে অবস্থান করে নাচ, গান ও গুণ-সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে এদের সাধনা চলে। বাউল সম্প্রদায় মনে করে পরম দেবতা রাধা-কৃষ্ণ মানবদেহে অবস্থান করে তাই দেহতত্ত্বের জ্ঞানলাভ হলে সাধনায় সিদ্ধি ঘটে। এদের উপাসনা খুবই গোপনীয় এবং এরা বিগ্রহবিরোধী, ধর্মসংগীতের মাধ্যমে এদের সাধনা চলে। ন্যারা সম্প্রদায়ও বাউলের মতো প্রকৃতি-সাধনা করে, বিগ্রহসেবা তাঁরা করে না। নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় এই পাঁচ প্রকারে এদের ভজন চলে। গুরু-শিষ্যা কৃষ্ণ ও রাধা জ্ঞানে রাসলীলায় প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ সহজ সাধনায় লিপ্ত হয়। চৈতন্য সম্প্রদায়ের অপর শাখা দরবেশ সম্প্রদায় উদাসীন হয়েও নারী-সংসর্গ করে এবং সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কর্তাভজারা মনে করে প্রেমেই মুক্তি এবং তাঁদের মতে মানুষই একমাত্র সত্য।

সাধ্বিনী সম্প্রদায় প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধ আচরণকেই পরমার্থ সাধনা মনে করে। সখীভাবক সম্প্রদায় নিজেদের নারী ভেবে রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করে। বিন্দুধারী ও অতিবড়ী সম্প্রদায় বিগ্রহসেবা ও মচ্ছব পালন করে থাকে। পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদদাসী, অনহদ্‌পন্থী ও বীজমার্গী সম্প্রদায়ীরা অনেকেই দেহসাধনা অবলম্বন করে, মার্জিত নাগরিক রুচিতে যা বীভৎস ক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত। মূলত প্রান্তিক শ্রেণির বৈষ্ণবদের সাধনার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, সামাজিক দিক থেকে তারা এতটাই নিম্নস্তরে বাস করে যে দেহ ছাড়া নিজের বলতে তাঁদের আর কিছুই নেই। তাই সেই দেহকে আঁকরে ধরেই তাদের সকল সাধনা।

দশনামী শৈব সন্ন্যাসীরা নিজেদের নির্গুণ উপাসক হিসেবে পরিচয় দেয়। দশনামীদের একটি শাখার নাম দণ্ডী, এরা বিশ্বাস করে দণ্ড গ্রহণের পর সন্ন্যাসীর পুনর্জন্ম হয়, দণ্ড গ্রহণের পর পৈতা এবং শিখা সুপারির সঙ্গে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলতে হয়। নির্গুণ উপাসক হলেও প্রণব জপ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান তাঁদের পালন করতে হয়। সন্ন্যাসীদের নির্জন একাকী স্থানে বাস করতে হয়, এরা তন্ত্রসাধনাও করে থাকে। ১২ বছর পর দণ্ড ত্যাগ করে এরা পরমহংস আশ্রমে প্রবেশ করে। শৈব সম্প্রদায়ের কূটীচক ও হংস উপাসকেরা শিবলিঙ্গ অর্চনা করে। বহূদক শৈবরা দেবপূজা করে এবং পরম হংসেরা জপ ও জ্ঞানানুশীলন করে থাকে। কেউ কেউ বীরাচার অবলম্বন করে মদ্যপান করে থাকে। তবে এরা সবাই মোক্ষাভিলাষী।

আলেখিয়া সম্প্রদায় 'অলখ' নাম উচ্চারণ করে ভিক্ষা করে বেড়ায় এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ভোজন করায়। অক্ষয়কুমার বলেন, "সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহাদের বৃত্তি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বোধ হয় এ বৃত্তিটি ভূলোকের অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট লোকের উপযুক্ত।" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: ৯৪)

অঘোরী সন্ন্যাসীরা বিকৃত আচরণ করে থাকে, বিষ্ঠাকে চন্দন সমতুল্য মনে করে সর্বাঙ্গে মাখে এবং ঘৃণিত বস্তু ভক্ষণ করে। কিছু কিছু সন্ন্যাসী কঠোর তপস্যা হিসেবে কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রবৃত্ত হয়, ঊর্ধ্ববাহু সম্প্রদায় সবসময় হাত উপরদিকে তুলে রাখে। আকাশমুখীরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে আর নখী সন্ন্যাসীরা তাদের নখ রক্ষা করে। ঠারেশ্বরী সম্প্রদায় সবসময় দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ মৌনব্রত অবলম্বন করেন। আবার কড়ালিঙ্গী উপাসকেরা নিজেকে জিতেন্দ্রিয় প্রমাণের জন্য শিশ্নে লৌহকুণ্ডল দিয়ে রাখে। কেউ আবার ভোজন প্রক্রিয়ার নিয়মানুসারে নাম প্রাপ্ত হন। দশনামী সন্ন্যাসী ভিন্ন আতুর সন্ন্যাসী, মানস সন্ন্যাসী ও অন্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়।

পাতঞ্জল দর্শনে যোগসাধনার উল্লেখ আছে, যারা যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হয় তাঁরাই যোগী; এরাও শৈব হিসেবে পরিচিত। এরা আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যোগ-সাধনা করে থাকে। অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত রস এবং মৎস, মাংস, মদ্য ইত্যাদি যোগীদের ভোজন নিষিদ্ধ কেবল যব, ধান, দুধ ও মধু খেতে পারে। স্ত্রী-সংসর্গ এদের নিষিদ্ধ। যোগাবলম্বনে এরা ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগ করে পরব্রহ্মে লীন হয়ে অশেষ আনন্দ লাভ করে। কণ্‌ফট্ যোগীরা হঠযোগের মাধ্যমে শিবের উপাসনা করে। দশনামী ভাঁট সম্প্রদায় কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বংশলতিকার বিবরণ রাখে। এরা মদ্যপান করে এবং শৈব হয়েও সরস্বতীর পূজা করে থাকে।

শাক্ত তান্ত্রিকেরা দেবী শক্তির প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, জল, নৈবেদ্য, মদ্য, মাংস দিয়ে পূজা করে। বীরাচারী শাক্তেরা মদ ও মাংসের দ্বারা পূজা করে তবে পশ্বাচারীরা তা করে না। তবে পশুবলি উভয় সম্প্রদায়েই বিধেয়, যা শক্তি উপাসনার প্রধান অঙ্গ। দক্ষিণাচারী শাক্তেরা অবশ্য বেদাচারের নিয়ম অনুসারে পূজা করে কিন্তু বামাচারী শাক্তেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চ মকারে শক্তির উপাসনা করে থাকে। মৈথুন প্রসঙ্গ চলে আসায় এদের মধ্যে দেহতত্ত্বের সাধনা চলে বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষে একত্র মিলে এরা মৈথুনে রত হয়, কারণ আনন্দোল্লাস উপাসনার অংশ বলে তাঁদের বিশ্বাস। যদিও মার্জিত রুচিতে এই ধরণের সাধনা ব্যাভিচার ভিন্ন আর কিছু নয়। অনেকে আবার স্ত্রীকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করে থাকে। বীরাচারী সম্প্রদায় আবার শবসাধনাও করে থাকে। রাজস্থানের চলিয়াপন্থী সম্প্রদায় আবার স্ত্রী ভাগাভাগি করে সাধনা করে। আবার করারী শাক্ত সম্প্রদায় কালী, চামুণ্ডা প্রভৃতি উগ্র দেবীর উপাসক, এরা নিজেদের শরীরের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহারের মাধ্যমে উপাসনা করে।

ভারতবর্ষ জুড়ে এমন অসংখ্য উপাসক সম্প্রদায় রয়েছে; এদের ধর্ম মূলত কৃত্যমূলক এবং স্পষ্টতই তা অবৈদিক। প্রান্তের ব্রাত্য মানুষ সমাজের কেন্দ্রে কোনো স্থান না পেয়ে নিজেদের প্রয়োজনেই এসব সুবিধাজনক কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতি

গড়ে তুলেছে। আর এভাবেই যুগ যুগ ধরে সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

৪. ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব

যুগপ্রভাবে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক জীবন চেতনায় স্থিত হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। সময়ের চেয়ে অগ্রবর্তী এই চিন্তক, প্রাচ্যবিদ্যা চর্চাকারী এদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম। পাশ্চাত্য তার অধীন নিকৃষ্ট-অপর হিসেবে প্রাচ্য তথা ভারতকে পাঠ করার যে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিল, তার প্রত্যাঘাতও এসেছে। গভীরতর উপনিবেশের এ যুগে বংলার বুদ্ধিজীবীরা উপনিবেশকে আত্মস্থ করে নিলেও,যে জীবনজিজ্ঞাসা ইউরোপকে তাড়িত করেছিল বিশ্বজয়ে নামতে, সেই জীবনজিজ্ঞাসাই অক্ষয়কুমারকে আত্মানুসন্ধানের দিকে ধাবিত করেছিল ।ভারতীয় ভারতবিদেরা যখন ভারতবিদ্যা নিয়ে চর্চা করেছে তখন পাশ্চাত্যের অস্ত্র বুমেরাং হয়ে ফিরে গেছে, এদিকে ভারতবর্ষে জেগে উঠেছে স্বাদেশিকতার বোধ। তাঁরা ইউরোপের জ্ঞানকাণ্ডের আগ্রাসনের সমালোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, তাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গভরে বলতে শুনি,

> এমত সময়ে দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা লাঠি হাতে দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিলাতি অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "একি হইল? সাহেবেরা বলিলেন, ইহাকে বলে *Asiatic Research*. (বঙ্কিম, ২০১৬:১২২)

ইউরোপীয়দের ধারণা ছিল প্রাচ্যের মানুষ এখনও পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতের বিশ্লেষণক্ষম প্রজ্ঞার অধিকারী হয়নি, কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁদের ভুল ভেঙে দেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের মন্তব্য, প্রমাণের সার্থক প্রয়োগ করে তিনি তাঁর চিন্তার তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ ম্যাক্সমুলার বলেছেন. "I am glad to see your countrymen begin to appreciate the labours of English and german scholars."(উদ্ধৃত, মহেন্দ্রনাথ, ১২৯২: ১৮৫)

অক্ষয়কুমারের মধ্যে দেখা যায় যুগপৎ তিনি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে যেমন নিবিষ্ট হয়েছেন তেমনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে ভারতীয় সমাজে জেঁকে বসা কুসংস্কার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সমানে কলম চালিয়েছেন। তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন,প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি কোনো বিচারেই ন্যূন নয়, বরং নানাদিক দিয়ে ভারত শ্রেষ্ঠ। পরমাণুর আবিষ্কারক হিসেবে আমরা ডালটনের নাম জানলেও বৈশেষিক দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয় জানিয়েছেন,

> ইয়ুরোপের মধ্যে পরমাণুবাদ এখন সর্ববাদি-সম্মত। শ্রীমান ডেলটন ইদানীং ইহার পুনরুদ্ভাবন করেন এবং রসায়ন-বিদ্যা সংক্রান্ত বিচারক্রমে একরূপ সপ্রমাণ অথবা

> অতিমাত্র সম্ভাবিত করিয়া তুলেন। তাহার দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিককাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মহর্ষি কণাদ এই মত প্রবর্তিত করেনতাহার সন্দেহ নাই। (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: ১৯)

সভ্যতার ইতিহাসে গ্রিক সভ্যতাকে উৎকর্ষের মানদণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ মানা হলেও ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে গ্রিক দর্শনের প্রভূত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বিশ্বের কারণ, সৃজন, সৃষ্টি ও প্রলয়, নিয়তি, জড় পদার্থের নিত্যতা এবং তার সঙ্গে মনের সম্বন্ধ, পরমাণুবাদ, পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য এবং তা থেকে জড় ও জীবের উৎপত্তি, পরমাত্মায় জীবাত্মার লয় প্রভৃতি বিষয় ভারতীয় এবং গ্রিক উভয় দর্শনেই আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ যুক্তি ও প্রমাণ উল্লেখ করে অক্ষয় জানিয়েছেন, ভারতীয়দের দর্শনচিন্তায় গ্রিসের প্রভাব পড়েছে এমন কোনো প্রমাণ বা সম্ভাবনা দেখা যায় না বরং গ্রিকরা ভারতীয় দর্শনভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এমন অনেক যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব।

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন সুদৃঢ় করার জন্য ইউরোপীয় বণিকদের পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতাও অব্যাহত ছিল। মিশনারিরা যিশু খ্রিস্টের বাণী প্রচারে যতটা না আগ্রহী ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী ছিল সাম্রাজ্যবাদের পালে হাওয়া দিতে। খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিষোদগার, তাদের প্রধান কর্তব্যে পরিণত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ উল্লেখ করে জানান, যে ধর্ম নিয়ে পশ্চিম গর্ববোধ করে সেই ধর্মও ভারতবর্ষের কাছে ঋণী। ভারতের প্রাচীন ধর্ম বৌদ্ধধর্মের দান, দয়া, ক্ষমা এবং সত্যের উপর গুরুত্ব প্রদান, গুরুর কাছে পাপ অঙ্গীকার, জাতি-বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে ধর্মোপদেশ প্রদান, সন্ন্যাস প্রথার প্রবর্তন, ঘণ্টা ও জপমালা ব্যবহার, দেবালয়ে দীপদান ও গন্ধদ্রব্য প্রদান, ধর্মসঙ্গীত এবং ধর্মপ্রচারক প্রেরণ প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, তাই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম থেকেই খ্রিস্টধর্মের উদ্ভব হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। কেননা এক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা অনুকরণ করা স্বাভাবিক বিষয়।

রেনেসাঁ ইউরোপের জীবনে পারলৌকিকতার পরিবর্তে এনে দিয়েছিল ইহলৌকিকতার সুবাতাস, ফলে স্থবির, কুসংস্কারাচ্ছন্নতার জায়গায় তারা আবাহন করেছিল জীবনবাদী সংস্কৃতিকে। ভারতবর্ষেও কিছু মহামানবের জন্ম হয়েছিল যারা ধর্মীয় কুসংস্কার আর অনাচারে নিমগ্ন হিন্দু সমাজে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আমরা রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম জানলেও অনেকটা আড়ালেই থেকে যায় অক্ষয়কুমার দত্তের নাম। বাল্যবিবাহ যেমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তেমনি বিধবাদের বৈধব্যযন্ত্রণারও কোনো নিবারণ ছিল না ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজে। অক্ষয় প্রাচীন শাস্ত্র থেকে উল্লেখ-উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন যে, প্রাচীন

ভারতীয় সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না এবং বিধবা বিবাহের উপরও কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সায়নাচার্যের টীকাভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বিধবা বিবাহ বেদ-বিহিত বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। আবার মানব ধর্মশাস্ত্র তথা মনুসংহিতা থেকে প্রমাণ উল্লেখ করে অক্ষয় বলেন,

> স্বামী যদি নপুংসক, বন্ধ্যা বা মৃত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র-বিধানক্রমে অন্য পুরুষ সংসর্গে গুরুজনের নিয়োগানুসারে তাহার ভার্য্যার যে পুত্র জন্মে, তাহাকে স্মৃতিকারেরা ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯:উপ.৬৪)

সময়ের সাথে সাথে বৈদিক ধর্মে কলুষতা প্রবেশ করেছে, ধর্মের নামে কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়েছে। সত্য-সুন্দরের আরাধনা ধর্মের আকর হলেও কালক্রমে ধর্মীয় আচার কদর্য হয়ে উঠেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজের সুখের জন্য বাল্যবিবাহের মতো কুসংস্কারকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তথ্য-প্রমাণ সহযোগে অক্ষয় জানিয়েছেন, প্রাচীন ভারতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পুরুষকে যথাক্রমে ৮-১৬, ১১-২২ এবং ১২-২৪ বছর বয়সে উপনয়ন-সংস্কারের পর গুরুগৃহে যথাক্রমে ৩৬, ১৮ ও ৯ বছর অবস্থান করার পরেই গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ করা যেত, তাই বাল্যবিবাহের সুযোগ সেসময় ছিল না।

অক্ষয় এটাও জানিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে নারীর গান্ধর্ব বিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথার প্রচলন থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে সময় নারীরও বাল্যবিবাহ অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। এছাড়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর অধিকার হরণ করে নিলেও প্রাচীন ভারতে নারী যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতো, যার দরুণ বেদের অনেক সূক্তই নারীর রচনা। অক্ষয়কুমার প্রাচীন ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে বলেছেন,

> তাঁহারা (আর্য্য-বংশীয় স্ত্রীগণ) দেবার্চ্চনায় ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারিণী ছিলেন, যজ্ঞ-সমাজেও উপস্থিত থাকিতেন, উদ্বাহকালে যৌতুক লাভেও সমর্থ হইতেন ও স্থল বিশেষেদুহিতৃ-পুত্রেরা শাস্ত্রানুসারে মাতামহের ধন অধিকার করিতেন। বিশ্ববারা নাম্নী একটি অত্রি বংশীয় স্ত্রীলোক ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত একটি সূক্ত রচনা করেন এইরূপ লিখিত আছে। স্ত্রীজাতি শিক্ষালাভ বিষয়ে একবারে বঞ্চিত থাকিলে, ওরূপ কথার উল্লেখ থাকা কদাচ সম্ভব হইত না। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: ৮২)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণ করেঅক্ষয়কুমার যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। যেমন হিন্দু ধর্ম আদিতে একেশ্বরবাদী ছিল না বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল; এ প্রসঙ্গে ম্যাক্সমুলার একেশ্বরবাদের দিকে ইঙ্গিত করলেও অক্ষয়কুমার তা মেনে নেননি, তিনি আলবের রেবিল ও থিওডোর গোলডস্টুকর-এর মতামত যৌক্তিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবার শিকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক বিষয়ে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেখানে অক্ষয় তাদের মন্তব্য খারিজ করেছেন অবলীলায়। যথার্থ যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরে

তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। যেমন পারসিক ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তার নাম নিয়ে বিতর্কের নিরসনকল্পে তিনি বলেন,

> অবস্তা যে ভাষায় লিখিত, তাহাই ইদানীং জেন্দ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাও নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আঁকেতীই দু পেরঁ নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিতের কুশিক্ষা হইতে ঐ ভ্রমটি উৎপন্ন হইয়াছে।... ঐ ভ্রমটি সর্ব্বত্র এরূপ প্রচরিত হইয়া আসিয়াছে যে, এক্ষণে তাহা নিবারণ করা অতীব কঠিন। যাহা হউক এরূপ অমূলক আখ্যা আর চলিতে দেওয়া উচিত নয়। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: ৬৭)

সাম্রাজ্যবাদের দোসর প্রাচ্যবিদেরা যতই ভারতবর্ষকে সভ্যতা-সংস্কৃতিহীন বলে চিহ্নিত করুক না কেন উপাসক সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয় প্রাচীন ভারতের চিন্তার সমৃদ্ধিও গৌরবোজ্জ্বল বহু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। চিন্তা রাজ্যে ভারতের অধিকার যে ইউরোপের চেয়ে কম ছিল না বরং বেশিই ছিল, তাঁর বক্তব্যে সেটি ধরা পড়েছে। ভারতের মাটিতে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব এবং দৃঢ়মূল হিন্দু ধর্মের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতায় আশ্চর্য হয়েতিনি বলেন,

> অসাধারণ মানসিক বীর্য্য কেবল ইয়ুরোপেইউৎপন্ন হয় এমন নয়; এককালে ভারতভূমিতেও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় মানবীয় মনের অন্তর্ভূত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশি সতেজে বিনির্গমন পূর্ব্বক চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন করিয়াছিল। (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: উপ. ২৩৩)

ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শতাধিক বছর পরে অক্ষয়কুমার জাতির স্থবিরতা ও উদাসীনতা দেখে মর্মাহত হয়েছেন।ভারতীয়দের অতীত আর বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করে পরাধীনতার যন্ত্রণা ও হতাশা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর লেখায়। অশ্বমেধ, রাজসূয়, সর্পসত্র, লক্ষ্যভেদ এবং ধণুর্ভঙ্গপণ যে জাতির যাপিত জীবনের অংশ ছিল আজ সেই জাতি নিজেদের ইতিহাস ভুলে জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয়দের বীরত্ব ও তাদের যুদ্ধনীতি বিশ্বময় নন্দিত ছিল অথচ আজ তারা পরাজিত। অক্ষয় বলেন,"সে আকার নাই, প্রকার নাই, বীর্য্য নাই ও আত্মরক্ষারও ক্ষমতা নাই। ভারতভূমি! তোমার মহিমাসূর্য্য একেবারেই অস্ত গিয়াছে।" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: উপ. ১২৫)

দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় ভারতীয়দের মানসজগৎ এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, স্বাধীনতার স্পৃহা হারিয়ে তাঁরা উপনিবেশের অনুগত হয়ে উঠেছে এবং পরাধীনতাকে নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছে। অক্ষয়কুমার ব্রিটিশের সৃষ্ট শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে ইংল্যান্ড তথা উপনিবেশের সরাসরি বিরোধিতা করতে পারেননি কিন্তু আত্মসমালোচনার মাধ্যমে তিনি মূলত উপনিবেশেরই সমালোচনা করেছেন তাই অক্ষয়কুমার খেদ করে বলেছেন,

> ইংল-! ইংল-! তুমি অক্লেশে দুঃসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিয়াছ। বহু দূরস্থিত লক্ষ্য অনায়াসে বিদ্ধ করিয়াছ। বলিতে কি, তুমি অসাধ্য সাধন ও অঘটন সংঘটন করিয়া বিশ্বজনের নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়াছ। ...বাল্মীকি, কালিদাস, কণাদ ও আর্যভট্টের স্বজাতীয়বর্গকে পদাবনত করিয়া আজ সিংহাসন উজ্জ্বল ও উন্নত করিয়াছ।... তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষয়, বল ক্ষয়, আয়ুঃ ক্ষয় ও ধর্ম্ম ক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক কি বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: উপ. ১২৯)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জেগে ওঠা স্বাজাত্যাভিমানী ভারতীয় অক্ষয়কুমার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। সভ্যতা শেখানোর দোহাই দিয়ে ভারতীয়দের অবস্থা ক্রমাগত সঙিন ও নির্জীব করে তুলেছে ব্রিটিশ শাসন। আধুনিকতার নামে সমাজে যে সংস্কৃতির প্রচলন ঘটছে তার অশুভ ফল সমাজের অধোগতির কারণ হচ্ছে। পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় সবাই স্বার্থসিদ্ধির পিছনে ব্যস্ত। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছেন, "যে সুসভ্য বা সভ্যতাভিমানী রাজার রাজ্যতন্ত্রে মানবীয় মনের এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হয়, সে রাজারও কলঙ্ক, সে রাজ্যেরও কলঙ্ক, সে সভ্যতারও কলঙ্ক।" (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: উপ. ১৩১)

ভারতের আত্মিক এবং মানসিক দুরবস্থা অবলোকন করে অক্ষয় মর্মাহত হয়েছেন, তবে যে দৃষ্টির সাহায্যে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল অনুধাবন করতে পেরেছেন সে দৃষ্টিও তৈরি হয়েছে উপনিবেশবাদী জ্ঞানকাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেই। পরাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতা জাগলেও, স্বাধীনতা অর্জনের মতো আত্মনির্ভরশীলতা তখনও গড়ে ওঠেনি অর্থাৎ ইংল্যান্ডের শাসন মেনে নিতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই বরং ইংল্যান্ডের সুনজরের প্রত্যাশী তিনি। অক্ষয়কুমার এটাও মনে করেন, ভারতবর্ষের ভাগ্যের পরিবর্তন ইংল্যান্ডের দ্বারাই সম্ভব তাই উপনিবেশের শত যন্ত্রণার পরও তিনি সে যন্ত্রণার প্রতিকার চেয়েছেন ইংল্যান্ডের কাছেই,

> ইংল-! তোমার দয়া প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের উপায় নাই। আমরা কৃপাপাত্র; আমাদিগকে কৃপাদৃষ্টে দৃষ্টি কর এই প্রার্থনা।আমাদের রীতিমত রোদন-স্বর নির্গত করিবারও সামর্থ্য নাই। তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বেদনা সমুদায় নিরূপণ ও নিবারণ কর। তুমি আমাদের প্রতি নির্দ্দয় নও ইহা প্রসিদ্ধই আছে। (অক্ষয়কুমার,১২৮৯: ১৩১-১৩২)

৫. ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বের বিরোধিতা

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় গ্রন্থে অক্ষয়কুমার যে পাঁচ প্রকার উপাসক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন, সেসব সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক সম্প্রদায়ের বৈপরীত্য বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের অনুসারী। ভারতবর্ষে এই শাস্ত্রবহির্ভূত, ক্ষেত্রবিশেষে শাস্ত্রবিরোধী অসংখ্য উপাসক সম্প্রদায় রয়েছে যারা লৌকিক

বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর ভিত্তি করে তাদের উপাসনা পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছে। বৈদিকযুগে বেদে ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় বেদদ্রোহী, ব্রতপালনকারী ব্রাত্যদের মাধ্যমে নানা কৃত্যমূলক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। আর এই ব্রাত্য মানুষগুলো অধিকাংশই কৃষিজীবী, তারা কেউই শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না। এসব সাধারণ মানুষ বৈদিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্তিত হওয়ার পর ওই মানুষগুলো গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর পরমার্থতত্ত্ব সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছে। অথবা বলা যায় কর্তৃত্ববাদী জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কলিযুগে বেদোক্ত ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলেও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।আবার শাক্ত উপাসকেরা তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী সাধনা করে থাকে এবং তাঁদের উপাসনা বৈদিক উপাসনার মতো নয়। অক্ষয়কুমার বলেন,

> যে সমস্ত উপাসকসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত এ স্থলে লিপিবদ্ধ হইতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় বেদের শাসন ও ব্রাহ্মণবর্ণের আধিপত্য অস্বীকার করিয়াই প্রবর্ত্তিত ও প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ঐ শেষোক্ত সম্প্রদায়ীরা স্ব-সম্প্রদায় মধ্যে বর্ণবিচার পরিত্যাগ করেন, সকল বর্ণ হইতে গুরু ও শিষ্য গ্রহণ করেন এবং দেশ ভাষায় লিখিত সমধিক গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন। (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮ : ২)

বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, পৃথিবীর কোনো ধর্মই বিনাবিরোধে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, একথা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও প্রযোজ্য; ক্ষমতাবিস্তার প্রবণতা ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার আকাঙ্ক্ষাই এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লেখিত গুরুতর মতভেদ, এক মতাবলম্বীদের সঙ্গে অন্য মতাবলম্বীদের বিদ্বেষভাব সে দ্বন্দ্বের প্রমাণ বহন করে। আর এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সাধারণ হিন্দু সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধর্মের সঙ্গে ধর্মের যেমন বিরোধ রয়েছে তেমনি বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরোধ বিদ্যমান; এছাড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে অপরাপর উপাসক সম্প্রদায়ের বিরোধ তো আছেই। চামার রয়দাস যখন সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন, তখন তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ব্রাহ্মণদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়, এমনকি ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় রাজশক্তিও রয়দাসের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। তবে এসব অন্ত্যজ ধর্মগুরুদের মাহাত্ম্য লক্ষ করে রাজশক্তি তাঁদের গুরুত্ব মানতে বাধ্য হয়েছে। উনিশ শতকে রামচরণ নামক এক রামাৎ বৈষ্ণব দেব-প্রতিমা উপাসনায় বিমুখ হয়ে রামসনেহী সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন, এতে ব্রাহ্মণসমাজ তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে এবং ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় রাজশক্তিও রামচরণের উপর অত্যাচার চালায়। বাংলার চৈতন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘোরতর বিরোধ রয়েছে। মহারাষ্ট্রের বিথলভক্ত সম্প্রদায় আবার বেদ ও ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।

বিরোধ যেমন আছে তেমনি সমন্বয়েরও নানা নিদর্শন রয়েছে বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে, তবে এই সমন্বয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে ব্রাত্যদের ঘটেছে এমন ভাবার উপায়

নেই। ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে অবস্থান করা ব্রাত্যেরা নিজেদের প্রয়োজনেই সমন্বয়ের পথে হেটেছেন, অবশ্য কর্তৃত্ববাদীরা স্বার্থোদ্ধারের জন্য কখনও কখনও এদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হয়েছে। অক্ষয়কুমার কবীরপন্থী যে উপাসক-সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, সেই সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে মূলত হিন্দু-মুসলমান উভয়ধর্মের উপর সমান প্রতিবাদ করে অথবা বলা যায় হিন্দু-মুসলমানের জলাচল ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবার জন্য। সম্প্রদায় প্রবর্তক কবীর জাতিতে জোলা হলেও জ্ঞান জগতে তাঁর ব্যাপক দখল তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। মুসলমানেরা তাকে মুসলমান হিসেবে দাবি করলেও হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা হিন্দুদের বাধ্য করেছিল তাঁকে হিন্দু ভাবতে। তাই তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলিম উভয়েই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে হিন্দুরা কবীরচৌর এবং মুসলমানেরা গোরক্ষপুরে কবীরের সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করে। এই সম্প্রদায়ে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিবাদের পরিবর্তে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার মনোভাব দেখা যায়। আবার রামসনেহী সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান উভয় মতাবলম্বী সাধুদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ৪০০ শাখী অন্তর্ভুক্ত ছিল। চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রেম-ভক্তির অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যোগ দিতে পারে। আবার দরবেশ সম্প্রদায়ের ধর্মসঙ্গীতে আল্লা, খোদা, মহম্মদ নামের উল্লেখ দেখে বোঝা যায় এর উপর ইসলাম ধর্মের প্রভাব রয়েছে। দেখা যায় : সাঁই সম্প্রদায়েও হিন্দুমত-বিরুদ্ধ অনেক আচার-ব্যবহার রয়েছে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। রামবল্লভী সম্প্রদায় সকল ধর্মের শাস্ত্রকে সমান গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা করে। সকল মানুষের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চায় তারা।

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরোধ থাকলেও শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমন্বয় প্রয়াস লক্ষ করা যায় মধ্বাচারী ও খাকী নামের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে। বিশেষ করে শৈবদের সঙ্গে মধ্বাচারী বৈষ্ণবদের কোনো বিরোধ নেই বরং সদ্ভাবই পরিলক্ষিত হয়। ধারণা করা হয় সম্প্রদায় প্রবর্তক মধ্বাচার্য প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণব হন। আবার মাদ্রাজ ও মুম্বাইয়ে বড়গল ও তিঙ্গল বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্রাহ্মণকুলের আচার-ব্যবহার সংশোধন করে সমাজ সংস্কারের প্রয়াস পেয়েছে। অন্যদিকে বিথলভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাতিভেদ অস্বীকার করে এবং জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অনুসরণে মহাজনদের পদাঙ্ক পূজা করতো। এদের উপাসনার এমন সমন্বয় দেখে মনে হয়, "হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের যদি কখনও সামঞ্জস্য হইয়া থাকে, তবে এই বৌদ্ধ-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল।" (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮ : ২৪৬)

জাতিভেদ-বর্ণভেদের বিরোধিতা করেই বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়েছে, তাই রামানুজ সম্প্রদায়ে যেকোনো বর্ণের মানুষ শিষ্য হতে পারে। রামাৎ সম্প্রদায়েও শিষ্য গ্রহণে কোনো বর্ণভেদের স্থান নেই, জোলা, তাঁতি, চামার, রাজপুত, জাট, নাপিত সকলেই শিষ্য হতে পারে। আবার "রামানন্দীদিগের গৃহস্ত শিষ্য মধ্যে রাজপুত ও রণ-ব্যবসায়ী

ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত প্রায় সকলেই দরিদ্র ও ইতর জাতীয় লোক।" (অক্ষয়কুমার, ১৮৮৮: ৪০) দাদূপন্থী শিষ্যদের দেখা যায় বিষয়-রাগশূন্য বিরক্ত, কেউবা নাগা কেউবা বিস্তরধারী ব্যবসায়ী। রামসনেহী সম্প্রদায়ে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই দীক্ষা নিতে পারে। তবে গুরুতর কোন দোষ করলে সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কারেরও প্রথা প্রচলিত আছে। চৈতন্য সম্প্রদায়ে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যে কেউ শিষ্য হতে পারে। এর শাখা স্পষ্টদায়ক সম্প্রদায়ে যে কেউ শিষ্য হতে পারে কিন্তু গুরু হতে পারে কেবল উদাসীনেরাই। মহাপুরুষীয় ধর্ম সম্প্রদায়ে শূদ্র মহন্তও ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে পারে। বলরামীদের মধ্যেও বর্ণভেদ এবং জাতিভেদ নেই। এদিকে শাক্ত-তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে বর্ণবিচার নেই তবে এ সম্প্রদায়ের শিষ্য হতে গেলে প্রভূত গুণাবলির অধিকারী হতে হয় কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী গুরু-শিষ্য প্রায়ই দেখা যায় না। অবশ্য শীতলা পণ্ডিত নামে শাক্ত উপাসক সম্প্রদায়ে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষ যে কেউ প্রবেশ করতে পারে।

যদিও অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈদিক-লৌকিক কোনো ধর্মেই তাঁর আস্থা ছিল না। তবু বিশাল সংখ্যক মানুষ যারা প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে, সেই মানুষগুলোর আচার-ব্যবহার, তাদের সাধন-প্রণালী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের পর নির্মোহভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। বিনয় ঘোষকে বলতে শোনা যায়,

> তাঁর ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত রচনাকালে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস আলোচনার সূচনা হয়নি বলা চলে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর মন ও বুদ্ধি যেহেতু বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল, তাই তাঁর আলোচনার মধ্যে সর্বত্র একটা আশ্চর্য রকমের সংযম, নিস্পৃহতা ও অপক্ষপাতের পরিচয় পরিস্ফুট। ভাবাবেগের ভেলায় কোথাও তিনি ভেসে যাননি অথবা পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলোচনার মধ্যে কোথাও তাঁর অন্ধ অযৌক্তিক অনুরাগ বা বিরাগ ফুটে ওঠেনি। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের মতো তিনি যথাসাধ্য তাঁর সংগৃহীত উপকরণ পরিবেশন ও বিশ্লেষণ করেছেন। আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক যুগের খর-দ্বিপ্রহরেও যখন দেখা যায়, ধর্মসম্প্রদায়ের আলোচনায় মধ্যযুগের অন্ধতা ও মত্ততার দৌড়াত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে, তখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করতে হয় যে অক্ষয়কুমারের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' আজও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস সমীক্ষার যুগেও অদ্বিতীয় ও অবশ্য পাঠ্য। (বিনয়, ১৩৭৬: সম্পাদকীয়৩)

কিন্তু কোথাও একটা সুর কেটে গেছে মনে হয়; শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি যতটা নির্মোহ ততটা তিনি চৈতন্য সম্প্রদায়ের কর্তাভজা ও সখীভাবক এবং তান্ত্রিক উপাসকদের প্রতি হতে পারেননি। দেহসাধনা যে উপাসকদের প্রধান আচার, তাদের সবার প্রতি তাঁর আপত্তি লক্ষিত হয়। অবশ্য–

> জনসমাজ বিশেষের মধ্যে প্রচলিত বিচিত্র-বহুক্ষেত্রে বিকৃত ধর্মাচরণকে তিনি মানসিক রোগ বলেই মনে করতেন। সেই রোগ নির্ণয়ের কাজকে তিনি এক মহৎ কাজ বলে মনে করতেন। কেননা, রোগ নির্ণয় না হলে রোগের নিরাময় সুদূরপরাহত। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মাচরণকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃৎ। (আশীষ লাহিড়ী, ২০২০: ১৪)

বৈষ্ণবের দেহসাধনা প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী ব্যভিচার, যদিওএ সংস্কারচেতনা জাগ্রত হয়েছে স্পষ্টতই পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে। এছাড়া তিনি তান্ত্রিক সাধকদের সাধনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিব্রত হয়েছেন, কারণ সে সমস্ত লজ্জাকর ও ঘৃণাকর ব্যাপার ভদ্র সমাজে প্রকাশের উপযোগী নয়। তাই অক্ষয়কুমার উপাসকদের সেই দিকগুলো তুলে ধরতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> বহুবিধ কলুষিত বিষয়ের বিবরণে এই প্রবন্ধগুলিকে কলুষিত করা কোনোরূপেই প্রীতিকর নয়। কিন্তু কি করি; ধর্ম্ম-প্রধান ভারতমণ্ডলে বীভৎসাকার অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া গুপ্তভাবে কিরূপ ক্রীড়া করিতেছে, তাহা জনসমাজের গোচর না করিয়াই বা কি প্রকারে নিরস্ত থাকি? মল-গর্ভ অস্ত্র ছেদন করিয়া না দেখিলেই বা তাহার প্রকৃতি ও রোগ কিরূপে নিরূপিত হইবে।(অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: ২৭৩)

ধর্ম ও মোক্ষ লাভের সাধনাকে অক্ষয় মানসিক রোগ হিসেবে দেখেছেন এবং যে ধর্ম মানুষকে কুসংস্কার, হানাহানি ও জাতিভেদের নির্মম যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য করে সে ধর্মকে তিনি অধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেন। ব্রাহ্মণ সমাজকে তিনি রোগজীর্ণ বামুন সমাজ হিসেবে অভিহিত করেন। এছাড়া প্রচলিত ধর্মাচরণে যতপ্রকার অনাচার, শোষণ, বৈষম্য বিদ্যমান তা স্বার্থান্বেষী শ্রেণির স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতাবান শ্রেণির দ্বারা তৈরি করা; প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও দর্শনের আলোচনায় অক্ষয়কুমার এই বক্তব্যের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। কিছু কিছু উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি অক্ষয় দত্ত স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে কলহপ্রিয়, উগ্র নাগা সম্প্রদায়ের প্রতি। এছাড়া বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও বৈরিভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। তবে অক্ষয়কুমারের পর্যবেক্ষণে এই উগ্রতা, বিদ্বেষের অপরপ্রান্তে এমনও অনেক সম্প্রদায় ছিল যাদের মধ্যে শূচিবায়ুগ্রস্ততা ছিল না। প্রাচীন ভারতের দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, প্রায় সকল দর্শনেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়েছে, এমনকি বৌদ্ধধর্মেও; তবু সে সমাজে শান্তি বিরাজিত ছিল। তাই তাঁর যুক্তিশীল মন হিন্দু আবেগের স্রোতে গা ভাসায়নি, তিনি

> ঈশ্বর-বন্দনা, জাতিভেদ, বর্ণবিভাজন, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর কীর্তন করে তিনি তাঁর রচনা ধূলিলিপ্ত ও কলঙ্ক-মলিন করে তোলেননি। বরঞ্চ চলতি সমাজ-ব্যবস্থায় মান্য অসংখ্য আত্মঘাতী সংস্কারে তিনি ধারালো তলোয়ার বসিয়ে দিয়েছিলেন দ্বিধাহীনভাবে। সংস্কার ও পুরাতনের 'ভ্রান্তিভার' তিনি বহন করতে চাননি। (সাইফুল, ২০২০: ৩৫)

অক্ষয়কুমার তাঁর মার্জিত দৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রান্তিক উপাসকদের দেখেছেন, তাদের বিশ্বাসের বহুস্তরান্বিত রূপ তিনি উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখেছেন, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ,

আচার-অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ জটিল উপাসনার বেড়াজাল ছিন্ন করে, শাস্ত্রীয় ধর্মের বাইরে গিয়ে এসব সম্প্রদায় জটিলতামুক্ত সরল বিশ্বাস ও সংস্কৃতির চর্চা করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকলেও, এই মানুষগুলোর মন সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও গোঁড়ামিমুক্ত ছিল। অক্ষয়কুমারের বিবরণ থেকে জানা যায়, এদেশে হিন্দু হয়েও অনেকে মুসলমানের আরাধ্যকে শ্রদ্ধা করে এবং রোগ-শান্তি, ধন-প্রাপ্তি বা অন্য প্রকার শুভ লাভের উদ্দেশে সেই আরাধ্যের কাছে মান্‌সিকও করে থাকে। এই ঘটনাগুলো ভারতবর্ষে প্রান্তিক মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু উনিশ শতকে বাংলায় যে স্বাদেশিকতার উদ্বোধন ঘটেছিল তা ছিল দ্বিমুখী; আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত কেউ কেউ মার্জিত বুদ্ধি, উন্নত রুচি এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে উন্মুক্ত দৃষ্টির অধিকারী হয়ে উঠেন। অক্ষয়কুমার উক্ত দলের কর্ণধার ছিলেন, যিনি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বদেশচেতনা জাগ্রত করার প্রয়াসী ছিলেন। আবার অন্যদিকে আরেকদল ছিলেন, তাঁরাও ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন কিন্তু তাঁরা ধর্মকে আশ্রয় করে হিন্দুত্ববাদী উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসারে কাজ করে যাচ্ছিলেন। অচিরেই আধুনিক ভারতে সমাজ কাঠামোর মধ্যে ধর্ম যখন সবকিছু ছাপিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল, তখন অক্ষয়কুমার তাঁর *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের বাইরে অসংখ্য উপাসক সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ঘোষণা করেন, যা ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দ্যোতক। অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বেদবাদীদের ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন,

> বেদ-প্রাণ হিন্দুম-লি! শ্রবণ কর। তোমাদের প্রাচীন মীমাংসকগণ অর্থাৎ বেদ-মন্ত্রের মীমাংসাকারী পূর্ব্বকালীন আচার্য্যগণ না ঈশ্বরই মানিতেন, না দেবতাই স্বীকার করিতেন। তাঁহারা নির্দেব ও নিরীশ্বর। (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: উপ. ৪০)

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় চিরকাল ভক্তিতে মুক্তি অনুসন্ধান করেছে, বুদ্ধিশক্তিকে তারা চিরকালই এড়িয়ে গেছেন। এমনকি উপনিষদে যে জ্ঞানের উদ্ভাসন দেখা যায় সেখানেও আত্মজ্ঞান তর্কে পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউরোপে রেনেসাঁ তাড়িত মানুষ সফল হয়েছিল জীবনে সক্রিয়তা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে অক্ষয়কুমার সেই তৎপরতাই প্রত্যাশা করেছেন ঘুমিয়ে থাকা মানুষের জন্য। পাশ্চাত্য জ্ঞানকাণ্ডের যৌক্তিক ঈশ্বরবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের পর ধ্রুববাদ প্রভাবিত করেছিল অক্ষয়কুমার দত্তকে তাই শুধু নিরীশ্বরবাদ নয়, মানুষের মঙ্গলের লক্ষ্যে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ ইহজাগতিক সেক্যুলার ও মানবিক ধর্মের জাগরণ প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি।ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক সভ্যতার সুযোগ সুবিধা ভোগ করার পরেও যাদের এই মানসিক চেতনা জাগ্রত হচ্ছে না। তারা শিক্ষিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের মনোজগতে সে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি, তাদের মনে যে স্বদেশ চেতনা জাগ্রত হয়েছে তা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে পরিপূর্ণ। এমন স্বাদেশিকতা ক্রমশ উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে

ধাবিত হচ্ছে, যা সুদূরপ্রসারী বিপদ ডেকে আনতে সমর্থ। ঔপনিবেশিক ও উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কর্তৃত্বের শৃঙ্খল ভাঙার প্রয়াসে 'সভ্যতর নব্য সমাজ'-এর প্রতি অক্ষয়কুমার আহ্বান জানিয়েছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ভোগ-বিলাসে মত্ত না হয়ে আত্মসমীক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলো এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য। ধর্মভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ বিপদ আঁচ করতে পেরে,

> খাঁটি বৈজ্ঞানিক মেজাজ নিয়েই তিনি দেখেছেন যাবতীয় আস্তিক দর্শনকে আর সেই সঙ্গে বেদ-বাদী ও বেদ-বাহ্য ... উপাসক সম্প্রদায়কে। তাঁর আগেও এই একই বিষয় আলোচনা করেছিলেন এইচ এইচ উইলসন, পরেও করেছেন আরও অনেক গবেষক। কিন্তু অক্ষয়কুমারের আগে বা পরে কেউই আস্তিক দর্শন ও ধর্মমতকে 'মানসিক রোগ' বলে ঘোষণা করেননি। তাঁদের মনোভাব ছিল একান্তই অ্যাকাডেমিক; রোগের মূলোচ্ছেদ করার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। (রামকৃষ্ণ, ২০০৩: ১৬৮)

তাইভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের যুগে যখন সাম্প্রদায়িক বৈরিভাব তীব্র হয়ে উঠছিল, সে সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্রাট অশোকের রাজত্বের কথা স্মরণ করেছেন।সে রাজ্যে ধর্ম-সম্প্রদায় সকলেই স্নেহ, বাৎসল্য, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য ও অহিংসার পথে একাত্ম হয়ে মানবিক সমাজ গঠন করেছিল। এই মানবিক সমাজই ছিল অক্ষয়কুমারের কাঙ্ক্ষিত সমাজ। তাই অক্ষয়কুমার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন,

> অবনিমণ্ডলের অপরাপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরা এ অংশে যদি অশোকের পদ-রেণু-কণামাত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অসংখ্য লোকের ধর্ম্ম-দ্বেষ নিবন্ধন অকালে কালগ্রাস প্রবেশ নিবারিত হইত। বৌদ্ধগণ-সংহারক আস্তিক-প্রবর ব্রাহ্মণকুল! এই নাস্তিক নরপতির(অশোক) সুপবিত্র গুণগ্রাম শ্রবণ কর, আর লজ্জায় অধোমুখ হইয়া ধরণী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে থাক! উগ্রমূর্ত্তি শৈব ও বৈষ্ণব জমাতের ভয়াবহ তীর্থস্নানে ধিক্! ধিক্ ধিক্! খৃষ্টানদিগের শোণিতাক্ত মুণ্ডমালাবিভূষিত ভয়ঙ্কর ক্রুসেড্ যুদ্ধের ক্রস্ চিহ্নেও ধিক্! স্বসম্প্রদায়ের পক্ষপাত মদে উন্মত্ত দুর্দ্দান্ত মোসল্মান সম্প্রদায়ের কর সঞ্চালিত চাকচক্যশালী সুতীক্ষ্ণ তরবারেও ধিক্! (অক্ষয়কুমার, ১২৮৯: ২৪৫-২৪৬)

উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সভ্যতার অধিকারী ব্রিটিশ জাতি যখন ব্যবসা করতে এসে ভারতবর্ষের শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে তারা এদেশে বৌদ্ধিক আধিপত্য বিস্তারের আয়োজন শুরু করে।তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে প্রাচ্যবাদী জ্ঞানশৃঙ্খলার অনুগত একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তৈরি করে, অক্ষয়কুমার দত্ত শ্রেণিগত অবস্থান থেকে এই উপনিবেশিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির

প্রতিনিধি। এই শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের তথা উপনিবেশের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেনি বরং পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ঔপনিবেশিক শাসনকে বৈধতা দান করেছিল, তাঁরা মনে করতো ব্রিটিশ শাসন ভারতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, অসভ্য জাতিকে সভ্য করতে ব্রিটিশের আগমন হয়েছে। এ বুদ্ধিজীবিগণ ব্যাপকভাবে ইংরেজ শাসনের অনুগামী ছিলেন এবং তাঁদের আক্ষেপ ছিল যে তাঁরা ইংল্যান্ডের নাগরিক হতে পারলো না, বরং প্রজা হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে রইল। তবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই উদার মানবতাবাদে দীক্ষিত হয়ে মননশীলতার চর্চার মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারকরেন, এমন দেশীয় উদার মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি তাঁর *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* গ্রন্থে প্রাচ্য ওপাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান পেয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন ভারতের সংস্কৃতি অনেক বেশি জীবনবাদী; এর মধ্য দিয়ে একদিকে ইউরোপীয় ক্ষমতাকেন্দ্রের কর্তৃত্বের প্রতিবাদ করেছেন। অন্যদিকে বিভিন্নউপাসক সম্প্রদায়েরঅবৈদিক উপাসনা ও আচার পদ্ধতি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বের বিরোধী ভাষ্য রচনা করেছেন। উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ায় ধর্মীয় ও ভাববাদী ধ্যান-ধারণা এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের বহুল প্রসারে প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা যখন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছিল, সেই সময় উপনিবেশ তথা সাম্রাজ্যবাদ এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮৮৮)। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, কলিকাতা।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮৮৯)। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ*, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, কলিকাতা।

গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত (১৯৭৭)। *বিদেশী ভারতবিদ্যা পথিক*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২০১৬)। *কমলাকান্ত*, ড. খন্দকার শামীম আহমেদ সম্পাদিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত (১৩৭৬)। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, পাঠভবন, কলকাতা।

মহেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯২)। *শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত*, সংস্কৃত যন্ত্র, কলকাতা।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০০৩)। *কামারের এক ঘা*, পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় (২০১৯)। *রেনেসাঁসের আলোয় বঙ্গ দর্শন*, পুনশ্চ, কলকাতা।

শ্যামলী সুর (২০০২) । *ইতিহাসচিন্তার সূচনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ।

সাইফুল ইসলাম, মুহম্মদ (২০০৯) । *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ।

সুকুমার সেন (১৪২১) । *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, দশম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

সহায়ক প্রবন্ধ

আশীষ লাহিড়ী : *কেন অক্ষয়কুমার দত্তকে চাই*, কোরক, সম্পাদক: তাপস ভৌমিক, কলকাতা, বইমেলা ২০২০ ।

সাইফুল ইসলাম, মুহম্মদ : *জন্মদ্বিশতবর্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত*, কোরক, সম্পাদক: তাপস ভৌমিক, কলকাতা, বইমেলা ২০২০ ।